অলক্ষিত তীর্থ

কলঙ্কিত তীর্থ

জগদীশ গুপ্ত

বিশ্ববাণী

১১।এ, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

কলঙ্কিত তীর্থ

ভূমিকা

এই উপন্যাসের জন্য ভূমিকা রচনার কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু লিখতে হয়েছে এই কারণে যে, এর একটি ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস দীর্ঘকাল পরে এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে বলা প্রয়োজন বোধ করি।

বয়সের যথেষ্ট তারতম্য থাকলেও স্বর্গত জগদীশ গুপ্তর সঙ্গে আমার একটা আন্তরিক ভালবাসার যোগ ছিল, এবং তাঁর দিক থেকে এ যোগ সকল সাহিত্যিকের সঙ্গে ছিল বললেই ভাল হয়। সাংসারিক নানা বিপর্যয়, দুঃখ-দুর্দশা ও মানসিক আঘাতের মধ্যেও সে যোগ যেমন তিনি ছিন্ন হতে দেন নি, তেমনি সারা জীবন অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তাঁর সাহিত্যনিষ্ঠা ও মর্যাদা। প্রয়োজনে কয়েকখানি গ্রন্থের সর্বস্বত্ব অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করলেও, তাঁর সৃষ্ট-সাহিত্যের মর্যাদা কখনও তিনি ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। বহুকাল পূর্বে এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তিনি কোন এক প্রকাশকের কাছে দেন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য, এবং আমি তাঁকে সাহায্য করি প্রকাশক সংগ্রহ করে দেওয়ার ব্যাপারে। উক্ত প্রকাশক এই উপন্যাসের কলেবর-বৃদ্ধির জন্য এবং অংশবিশেষ অপেক্ষাকৃত অধিক রসঘন করে তোলার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু জগদীশ বাবু তাঁর আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য করে মুখের উপর বলেন যে, 'যে উপন্যাস যেখানে যখন সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং যে ঘটনা বিস্তারের যতটুকু ক্ষেত্র আছে, তার বেশী কোন ফরমাশী লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' অতঃপর তিনি উক্ত প্রকাশকের কাছ থেকে অগ্রিম যা নিয়েছিলেন তা প্রত্যার্পণ করে পাণ্ডুলিপিটি ফেরত নিয়ে আসেন। অগ্রিম নেওয়া এই টাকা ফেরত দিতে যদিও অন্যত্র তাঁকে ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল, তবু তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা ও সাহিত্যনিষ্ঠা দেখে সেদিন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর এই উপন্যাস অবিকৃত ও অপরিবর্ধিত অবস্থায় প্রকাশিত হতে দেখে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি, এবং আশা করছি, সাহিত্যরসিক পাঠক-পাঠিকারাও এই উপন্যাসের কাহিনী পাঠে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করবেন এবং এতদাতিরিক্ত কিছু আশা করবেন না।

গ্রন্থের কিঞ্চিৎ কলেবর বৃদ্ধির জন্য অধিকন্তু একটি ছোট গল্প এই সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে জগদীশ গুপ্তর জীবন ও সাহিত্যের উপর খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের রচিত একটি মূল্যবান নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। এই রচনা গ্রন্থকারের মূল্য নির্ধারণে যেমন সার্থক, তেমনি প্রেমেনবাবুর সহৃদয়তার অনুরাগ-রঞ্জিত।

সর্বশেষে এই গ্রন্থের প্রকাশককেও ধন্যবাদ দিই এই লোকান্তরিত সাহিত্যিকের একখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থকে দীর্ঘদিন পরে জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করার জন্য।

কলিকাতা-৬
১৫. ৬. ৩০

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

শেষ দাহের শিখায় একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম সাহিত্যের জগতে ক্ষণিকের জন্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

কিছুকালের মধ্যেই তা হয়তো আবার তমসাবিলীন হয়ে যাবে।

সে নাম জগদীশ গুপ্তের।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবনকালেই খ্যাতির প্রশস্ত রাজ-পথ থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে প্রায় অজ্ঞাত-বাসে ছিলেন। গুণগ্রাহী সন্ধানী রসিকের দূরবীক্ষণে ছাড়া সর্বসাধারণের স্থূল দৃষ্টির তিনি প্রায় অগোচর ছিলেন বললেই হয়। ছিলেন, তাঁর নিজের স্বভাবে কতকটা, আর কতকটা সাহিত্য-লোকের দুর্জ্ঞেয় নিয়তিতে।

সাহিত্যের এই নিয়তির রহস্য সত্যিই বোঝা কঠিন। সুবিচার অন্তত যে তার ধর্ম নয় তার দৃষ্টান্ত অজস্র। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো সে অহরহই আমাদের দেওয়ায়।

জগদীশ গুপ্তের বেলায় এই নিয়তির একটি নির্মম ঔদাস্যের উদাহরণ আমরা দেখলাম।

অন্তিম বহ্নিদীপ্ত তাঁর নাম আবার যদি অন্ধকারে মুছে যায়, সত্যি কথা বলতে গেলে তাতে দুঃখের এমন কিছু নেই। সব নামই তাই যায়, কিছু আগে বা পরে। দু-একটি যা থাকে তা শুধু আক্ষরিক পরিচয়ে নয়, থাকে, চিরন্তন জীবন প্রবাহের সঙ্গে এমন একটি বেগ হয়ে মিশে, যার নাম অবান্তর। আক্ষরিক নাম যাদের মুছে যায়, তারাও সেই প্রবাহে নিজেদের স্বল্পাধিক দানে অমর।

জগদীশ গুপ্তের মত লেখকের ভাবী বিস্মৃতি-সম্ভাবনায় দুঃখ তাই নেই। জীবনকালেই যে বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকা যেমন করে তাঁকে আচ্ছাদিত করেছিল, বিস্ময় শুধু তাইতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাসাহিত্যে যে একটা স্বাভাবিক আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তার প্রবর্তনায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের ঠিক পুরোবর্তী না হলেও জগদীশ গুপ্ত নগণ্য ছিলেন না।

দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে যেসব বিপর্যয় আজ প্রত্যক্ষ সাম্প্রতিক ইতিহাস, বিংশ শতাব্দীর সেই তৃতীয় দশকে তারই নাতিস্পষ্ট সুচনা তখন দেখা দিয়েছে। ভাঙন যে ধরেছে নানাদিকের চিড়খাওয়া চিত্তপ্রাসাদে তারই আভাস। এ যুগে যাঁরা লিখতে শুরু করেছিলেন, অসামান্য তাঁরা হয়তো তখন না করলেও তাঁদের ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্ত আত্মানুসন্ধানের অস্থিরতার মধ্যে সততার অভাব ছিল না। কি যে খুঁজছেন সব সময়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও নির্বিচারে মেনে নেওয়ার নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নতা তাঁরা অকাতরে বর্জন করেছেন। ভালোমন্দ সত্য মিথ্যা কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতির প্রশ্ন যাচিয়ে নেবার যে দুঃসাহস তাঁরা দেখিয়েছেন অপরিণত মনের মাত্রাহীনতায় তা ধৃষ্টতার সীমায় কখনো হয়তো পৌঁছলেও তাঁদের আন্তরিকতায় কলঙ্কপাত করেনি।

বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও অন্তরের তারুণ্যে জগদীশ গুপ্ত এই দলের দলী ছিলেন। তাঁর কলমে যে স্বাভাবিক শক্তি ছিল তাতে তখনকার নাম-কাটাদের দলে না ভিড়ে সম-বয়সীদের সনাতনী আসরে তিনি সহজেই সুনাম কিনতে পারতেন। কিন্তু সে সুনাম তাঁকে লুব্ধ করেনি। তার বদলে শিয়রে যার ব্যর্থতার অভিশাপ সেই বিপন্ন বিশৃঙ্খল যুগের অর্থ তিনি বুঝতে চেয়েছেন।

অত্যন্ত সাম্প্রতিক হলেও সে যুগের মোটামুটি চেহারাটা হয়তো একবার স্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত, মূলত শহুরে সমাজ তখনকার সংস্কৃতির ধারক তার পায়ের তলার মাটি তখনই বেশ টলতে শুরু করেছে। জমিদারী প্রথা লোপ পায় নি, কিন্তু তার শুষ্কপ্রায় মধু ঝাঁঝালো হয়ে এসেছে, পরাধীনতার গ্লানি তো আছেই তার সঙ্গে নিরুপায় নিষ্ফলতার হতাশায় অধিকাংশ জীবনের দিগন্ত পর্যন্ত আচ্ছন্ন। ইতিহাসের মানে 'অর্থমনর্থম'-এর মধ্যে নিহিত বলে ধরার রেওয়াজ শুরু না হলেও অসাম্য নিয়ে একটা ধোঁয়াটে বিক্ষোভ দেবতাদের ও নিয়তিকে ছেড়ে অন্য লক্ষ্য সন্ধান করছে। সামাজিক রীতি ও নীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য আর নেই, কিন্তু পুনর্বিচার তীক্ষ্ণ হলেও পরিবর্তনের ধারা তখনও ক্ষীণ বলা যায়। মেয়েদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রায় স্বীকৃত কিন্তু তার প্রকাশ অস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বাদশীর বদলে ষোড়শী বা বড়জোর অষ্টাদশীরাই নায়িকা। তাঁরা পুরুষের সঙ্গে জীবিকার্জনের প্রতিযোগিতায় এমন ভাবে তখনও নামেন নি যে ট্রামে-বাসে তাঁদের জন্য নির্দিষ্টের বেশী জায়গা ছাড়তে বিরক্তির গুঞ্জন ওঠে। ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে সমস্যার কাঁটা তখনও অনেক, কিন্তু বিদেশী শাসনের ক্ষতটাই প্রধান হয়ে আর-সব জ্বালা কিছুটা ভুলিয়েই রেখেছে।

সবসুদ্ধ জড়িয়ে, চিন্তায় ভাবনায়, আশায় আকাঙ্ক্ষায়, আদর্শে উদ্দেশে এমন-একটা অস্থির ঘোলাটে বিশৃঙ্খলা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে যার আকস্মিক প্রকাশ সেইসব সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিস্ফোরণের বারুদ কোথায় যে গোপনে সঞ্চিত হচ্ছিল কেউই ঠিকমত বুঝতে

পারেন নি। বুঝতে না পারলেও বারুদের অস্পষ্ট ঘ্রাণ যাঁদের সচকিত সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল, শুধু আমাদের দেশে নয় সর্বদেশের সাহিত্যেই তাঁরা তাঁদের ক্ষুব্ধ চাঞ্চল্যের ছাপ রেখে গেছেন।

এই ক্ষুব্ধ অস্থিরতাতেই জগদীশ গুপ্ত লঘুগুরুর নতুন মানদণ্ড খুঁজেছেন, রোমন্থন, রতিবিরতি, সুতিনী, অসাধু সিদ্ধার্থ ইত্যাদি নানা রচনায় জীবনের মূল্য ও মর্যাদা গাঢ় বেদনাময় সংশয়ের কষ্টিপাথরে নতুন করে যাচাই করবার চেষ্টা করেছেন।

এই বেদনাময় সংশয়ই, জগদীশ গুপ্ত শুধু নয়, সে-কালের অনেক লেখকেরই রচনার মূল সুর। মামুলী অনেক ধারণায় তাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছেন কিন্তু নতুন কোনো ধ্রুবভিত্তিও খুঁজে পান নি। জ্বলন্ত তাঁদের জীবন-জিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত তাই অনেক ক্ষেত্রেই তিক্ত নৈরাশ্যে ভস্ম-ধূসর। তবু মিথ্যা মোহের আবরণে দুর্বল আত্মপ্রতারণা যথাসম্ভব পরিহার করবার চেষ্টা যে তাঁদের ছিল, লঘুগুরুর মত যে কোনো একটি কাহিনী থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

লঘুগুরু পতিতাদের জীবন নিয়ে লেখা গল্প। পতিতাদের নিয়ে অনেক গল্প আমাদের ও অন্য দেশের সাহিত্যে লেখা হয়েছে। নির্বোধ সমাজের অন্যায় ঘৃণার প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক লেখকের কলম এমন বিপরীত দিকে ঝুঁকেছে যে ভাবালুতার কুয়াসায় বাস্তবতা সেখানেও সমান বিকৃত। জগদীশ গুপ্তের লঘুগুরু এই দুই সীমান্তের কোনো দিকেই সত্যভ্রষ্ঠ হয় নি। পতিতা সেখানে দেবীও হয়নি, পিশাচীও নয়। সমাজের যে অসুস্থ গ্লানি থেকে তার সৃষ্টি, সেই অস্বাভাবিকতার স্বরূপ জিজ্ঞাসা লঘুগুরুতে তাই এত

মর্মান্তিকভাবে করুণ। লঘুগুরু অসাধু সিদ্ধার্থ ইত্যাদির মত রচনা থাকা সত্ত্বেও জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবনকালেই যে বিস্মৃত হয়ে এসেছিলেন তার কারণ খুঁজে বের করা সত্যিই কঠিন। তবে তাঁর কাহিনীর সওদাগরিতে মোহের অঞ্জনের অভাব হয়তো তার একটি হেতু হতে পারে। তাঁর কলম হয়তো সর্বত্র সমান সূক্ষ্ম নয়, উদ্‌ভ্রান্ত যুগের প্রেরণায় তা হয়তো নিরর্থক গোলকধাঁধায় কখনো ঘুরে মরেছে, ভুয়ো ভব্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তা হয়তো সৌষ্ঠব-সংযমের সীমা কোথাও অতিক্রম করে গেছে, তবু পাঠকের মন ভোলাতে জীবনের উপর মিথ্যে রং চড়িয়েছে এ অপবাদ তার নামে বোধহয় দেওয়া যাবে না।

একাত্তর বৎসর বয়সে জগদীশ গুপ্তের মৃত্যু হয়েছে। সারাজীবন সাহিত্যের নিভৃত সাধনাই তিনি করে এসেছেন। এই নির্লজ্জ আত্মপ্রচারের যুগে সাধনার এমন নিষ্কাম নিষ্ঠাও বিরল। বর্তমানের নগদ মূল্য যথাযোগ্যভাবে তিনি পান নি ; ভাবীকাল তার ক্ষতিপূরণ করবে অনুশোচনায়, এমন আশ্বাস দেবার সাহসও আমাদের নেই, তবু জগদীশ গুপ্তের মত লেখক ব্যর্থ হতে পারেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। সময়ের স্রোতে সব কিছুই হারায়, তবু জীবনকে নির্ভীক নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখবার ও বোঝবার চেষ্টায় অসাধু সিদ্ধার্থের মত বই লেখবার জন্যে সারাজীবন রোগ শোক অভাব দারিদ্র্যের সঙ্গে অম্লান বদনে যিনি যুঝে এসেছেন, প্রত্যক্ষ-ভাবে না হোক, তাঁর সাহিত্যিক সাধুতা পরোক্ষভাবে ভাবীকালের অনুপ্রাণনা হয়ে থাকবেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রথম ঘটনা

দীর্ঘ দেড় বৎসর পরে কাল সকালে সাতকড়ি বাড়ী ফিরিবে।

চারটি ভাইয়ের সাতকড়ি দ্বিতীয় ; দু'টি বিদেশে থাকে, তবু বাড়ীতে লোকের ভিড় ; ভিড়ের মধ্যে সাতকড়ির স্ত্রীও বর্ত্তমান। এত লোকের কে একজন যেন নিঃশব্দে দিন গুনিতেছিল হঠাৎ সে প্রচার করিয়া দিল কাল সাতু বাড়ী আসিবে।

সাতকড়ির স্ত্রী মাখনবালাও দিন গুনিতে সুরু করিয়াছিল, কিন্তু অন্য ভাবে, স্বামীকে পুনরায় চোখে দেখার দিনটি সে দুরু দুরু বুকে ভয়ে ভয়ে গুনিতেছিল।

গুনিতে গুনিতে অবশ হইয়া একদিন সে ভুলিয়া গিয়াছিল ; সুরুর সূত্রটা মনে ছিল···আর গণনার শেষ দিনটা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার বুক কাঁপাইতেছিল ; কিন্তু একটি একটি করিয়া মাঝখানকার অসংখ্য দিন তার অসাড়ে উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।

আর সে চেষ্টা করে নাই, কিন্তু ভয়টা ছিলই···

স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের দিনটি এত নিকটবর্ত্তী শুনিয়া সে চমকিয়া ছিল। মাঝখানে ছোট একটা রাত্রি। সূর্য ঐ অস্তে যায়। এই সূর্য কাল আবার উঠিবে···তখন স্বামী আসিবেন।

জীবনের দিন গুলিকে এত সংক্ষিপ্ত মাখনের কোনদিন মনে হয় নাই। সাতকড়ি যে দিন যায় সে দিনের তখন কেবল প্রভাত···আজ এই সন্ধ্যা—

মাখনের মনে হইল, মাঝখানে কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস সে ত্যাগ করিয়াছে, নিঃশ্বাসটা শেষ করিয়া ফেলা হয় নাই ; বুক যেন নিঃশ্বাসের ভারে দুর্বহ হইয়া আছে।...ইহার মধ্যেই দেড় বৎসর কাটিয়া গেল।

বাড়ীতে আরো ঢের লোক আছে ; সবাই সাতুর আপন। কেউ ভাই, কেউ বোন, কেউ মা, কেউ ভাজ, কেউ আর কিছু।

কিন্তু এতগুলি পরমাত্মীয় থাকিতে মাখনের মনে হইয়াছে, সমগ্র ব্যাপারটার সঙ্গে তাহারই লিপ্ততা যেন সকলের চেয়ে বেশী—সেই বেশী করিয়া জড়ানো।...সে স্ত্রী, বাহির হইতে আহরিতা সামগ্রী।

বাহির হইতে আসিয়া সে স্বামীর কোন্ ক্ষেত্রটা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা কেহ অনুমান করিতে কখনো বোধ হয় মন খুলিয়া বসে নাই, তবু একটা স্থানে তার আধিপত্যের পরাকাষ্ঠা লোক যেন তাহার কাছে প্রত্যাশা করিয়াছে।

একটি স্থানে সে সর্বস্ব সর্বগ্রাসী, সতত জাগ্রত। সে তাহার দাবি পূর্ণতম মাত্রায়, একটি অনুপরিমাণ প্রাপ্যের মায়া ত্যাগ না করিয়া অশেষ শক্তিশালিনী দশভূজার মত দশ হস্তে কাড়িয়া টানিয়া ছিনাইয়া আদায় করিয়া লইবে—ইহা যেন মানুষের চৈতন্যের মত যেমন সহজ তেমনি অকুণ্ঠ ব্যাপার।

কিন্তু সেই ক্ষমতা সে দেখাইতে পারে নাই...

সংসারের প্রত্যেকটি লোকের কাছে এই অক্ষমতার লজ্জায় তার মুখ হেঁট হইয়া গেছে।...

বিবাহের পর শ্বাশুরী কতবার আভাসে ইশারায় জানাইয়াছেন যে, ছেলের বন্ধন সে-ই, জীবনের শৃঙ্খলা সে-ই, সৌষ্ঠব, শ্রী, সুখ, সৌন্দর্য একমাত্র তারই হাতে।

সবারই সেই মত।

বাড়ীর বাহিরের লোকেরও সেই ইঙ্গিত, সেই ইচ্ছা, সেই জ্ঞান।

মাকে ডিঙ্গাইয়া অগ্রজ অনুজকে অতিক্রম করিয়া সে-ই সব। একটি লোকের জন্য এই সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য স্থানটি অকপটে ছাড়িয়া

দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে কাহারো বাধে নাই, কেহ ইতস্ততঃ সন্দেহ করে নাই, শ্বাশুরী যেন পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন তার…অস্তিত্বই যেন অপরাজেয় অপরিহার্য শাসন-বাণী…তাহাকে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই।

কিন্তু আজ সে পরাস্ত।

শাসনদণ্ড ধূলায় লুটাইতেছে; সে আজ এত তুচ্ছ অকর্মণ্য গুরুত্বহীন যে তার থাকা না থাকার সমান মূল্য। দুনিয়ার লোকে কি বলিতেছে কি ভাবিতেছে সে জানে না; কিন্তু স্বামীর জীবন হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিয়া লইয়া সেত' সরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেনা… তাহার পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র…স্বামীর সত্তার বাহিরে যে জীবন্ত পৃথিবী রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে সংযোগ তার স্বামীকেই বৃন্ত করিয়া, স্বামীকেই বৃন্তরূপে পাইয়া সে চারিদিকের হাওয়ার মাঝে ফুটিয়া আছে…তাহার পরিচয়ই ঐ।

একদিন হঠাৎ কি হইয়া গেল। পৃথিবী তার পথ ছাড়িয়া উল্টাইয়া পড়িল। যেখানে যে বস্তুটি সুবিন্যস্ত ছিল বলিয়াই সে সুখে ছিল, একটিবার চক্ষের পলক না পড়িতেই তাহা মিলিয়া মিশিয়া বিকৃত একাকার হইয়া তার সেই পৃথিবী ছন্নছাড়া মৃতের শশ্মান হইয়া গেল।

স্বামী জেলে গেলেন।

যে কুঞ্জ মক্ষিকার গীতিগুঞ্জরণে মুখর ছিল, প্রচণ্ড ধাক্কায় তাহা এলাইয়া পড়িল; যে আকাশ আলোর মালা, মেঘের ঢেউ, বায়ুর কাঁপন দিয়া সাজান ছিল, তাহা ছিট্‌কাইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল; ভাবনার দলগুচ্ছ আর মনের তৃষ্ণা দিয়া তৈরি যে নীড় অনন্য ছিল, তাহার চিহ্নও রহিল না। মন্দিরের নিত্য অর্চনোৎসব বন্ধ হইয়া গেল। ফুলের বুকের মধুরস তিক্ত হইয়া উঠিল।

যে পথে সে আলো দেখিত, যে পথে সে গান শুনিত, যে পথে সুধা ঝরিত, চক্ষের নিমেষে সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া জগতের সঙ্গে তার আর সম্পর্ক রহিল না।

কিন্তু তাহার এই চরম দুর্গতির অংশ লইতে কেহ বুক বাড়াইয়া আসিল না।

তাহার মনে হইতে লাগিল, একটা ছিছি রব তাহাদেরই গৃহকেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া ছড়াইতে ছড়াইতে যেখানে যতদূরে মানুষ বাস করে, প্রাসাদে কুটীরে, পথে পাথারে, পৃথিবী যেখানে সত্য সত্যই আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই শেষতম প্রান্তরেখা পর্যন্ত সেই শব্দ পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে। জীবজগৎ শিহরিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া বসিয়া আছে।

এই দুর্বিসহ লজ্জা অখণ্ড একখানা গুরুভার মেঘের মত কেবল তাহারই বুক জুড়িয়া অক্ষয় হইয়া রহিল—

'আমিও তোমার সঙ্গে আছি' বলিয়া ভার বণ্টন করিয়া লইতে কেহ আসিল না।

স্বামীর অপরাধ গুরুতর, এত যে, তার চিন্তাই সহ্য হয় না। মানুষ কোনদিন তাহা সহ্য করিতে পারে নাই। সন্তানের জননী হইয়া স্বামীর স্ত্রী হইয়া কুলের বধূ হইয়া, নারী তাহা ক্ষমা করে নাই; ভগবানের নাম বুকে আছে, পশু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি নাই জ্ঞান যার আছে, সে তাহা ক্ষমা করে নাই।

স্বামী এমনি অচিন্তনীয় অপরাধ করিয়া জেলে গিয়াছিলেন—মুক্তি পাইয়া কাল ফিরিয়া আসিবেন। গৃহের আর সবাই তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত, ভৃত্যটি পর্যন্ত। বিমর্ষ থাকিয়া থাকিয়া তাহারা শ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই শ্রান্তির মাঝে যেন তাহাদের লজ্জাবোধের সমাধি হইয়াছে তাহাদের পরমাত্মীয়টি এতদিন গৃহে নাই।

মাখনের তা মনে আছে, যেমন তার মনে আছে সে আছে, বাইরের ক্ষুধা আছে, স্পর্শ আছে, দৃষ্টি আছে।

কিন্তু না থাকিলেই ভাল হইত।

...মাখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, রাত্রি তখন গভীর। আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া একবার ভগবানকে সে ডাকিল...

এতবড় আকাশের যেখানে যে জ্যোতির্বিন্দুটি ছিল, মেঘের গাঢ় প্রলেপে তাহা একেবারে চিহ্নহীন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। থই থই অন্তহীন কালোর পাথারে পৃথিবী ডুবিয়া গিয়াছে, তার শ্বাস বহিতেছে না...

মাখনের ভয় করিতে লাগিল—

কালোর অতলগর্ভে অবতরণ করিয়া কাহারা যেন মন্থনে রত হইয়াছে—তাদের হারানো রত্ন খুজিতেছে। তাদের হাতের শব্দ নাই, পায়ের শব্দ নাই, মুখে শব্দ নাই। তাদের নির্মমদণ্ড প্রহারে আবর্ত কেন্দ্র হইতে ঢেউ ছুটিতেছে...আগে ধোঁয়া, তারপর ফেনমুখী হলাহল উদগারিত হইতেছে। সেই হলাহলের পাত্র হাতে লইয়া কে যেন অগ্রসর হইতে লাগিল।

কালের মাঝেই কালো মূর্তিটি স্পষ্ট ; যেমন নিঃশব্দ তেমনি দৃঢ়।

ঐ হলাহল তাহাকে পান করিতেই হইবে নিস্তার নাই। কতদূর হইতে কালোর কালো স্তর-গুণ্ঠন ঠেলিয়া ঠেলিয়া মূর্তি অগ্রসর হইতেছে আসার তার বিরাম নাই...অনন্ত কাল ধরিয়া সে যেন আসিবেই, পথের তার শেষ নাই—

কবে পৌঁছিয়া সে পাত্রটি তার হাতে দিবে!

বড়জা গোলাপ প্রথমে উঠিয়াছিল—

সে উঠানে আসিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং সে চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া সবাই দেখিল, মাখন মূর্চ্ছিত হইয়া উঠানে পড়িয়া আছে।

শাশুরী ছুটিয়া যাইয়া বধূর মাথা কোলে লইয়া বসিলেন।

আজ ছেলে আসিবে যে!

গোলাপ আধ মিনিটে তিন বালতি জল তুলিয়া ফেলিল, নিতু মাখনের মুখে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিল,—কাকীমা কাকীমা! সতীশ মুখ বাড়াইয়াই ফিরিয়া গেল।

গোলাপের নিতুকে সরাইয়া দিয়া মাখনের মাথায় জল ঢালিতে লাগিল বিরাজ পাখা করিতে লাগিলেন...এবং অল্পক্ষণ পরেই মাখন চোখ খুলিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে করিতে পারিল না যে, যে দৃশ্যটি মনে পড়িতেছে, সেই দৃশ্যটি সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, কি সত্যই ঘটিয়াছিল।

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌমা কেমন আছ?

কিন্তু বৌমা কিছু বলিবার পূর্বেই সাতকড়ির দাদা সতীশ নামিয়া আসিল।

বিরাজ বলিলেন,—কোথায় যাচ্ছিস্?

—সাতুকে আনতে যাচ্ছি মা!

—যা।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—বৌমা উঠানে এসে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন কি করে?

—তাইত' ওকে শুদোচ্ছি। তুই ভাবিস্‌নে ভালই আছে।

অর্থাৎ ছেলেকে আনিতে যাইবার পথে বৌমার জন্য উৎকণ্ঠায় কাল বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

—যাই। বলিয়া সতীশ বাহির হইয়া গেল।

ধরিয়া আনিবার দরকার সাতুর নিজের ছিল কি না কে জানে;

কিন্তু একা একা অনিমন্ত্রিতের মত গৃহে প্রবেশ করিতে সাতু সঙ্কোচ বোধ করিতে পারে—

তাহারই নিবারণ কল্পে বিরাজ ও তাঁর বড় ছেলে একটু চেষ্টা করিলেন। সতীশ ভাইকে আগ-বাড়াইয়া আনিতে গেল।

বিরাজ ও বড় বউ তখন মাখনকে লইয়া পড়িলেন।

—অসুখ করেছে?

মাখন নির্জীবের মত বসিয়াছিল; বলিল—না।

—তবে? ভয় পেয়েছিলে?

—না।

—তবে

মাখন বলিল,—রাত্রে ঘুম হল না, বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম কখন কেমন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে' গেছি জানিনে।

বলিয়া মাখন উঠিল।

নিতু মাখনের কাপড় ধরিয়া আহ্লাদে লাফাইতে লাগিল।

অনেক বেলায় সতীশ ফিরিল, কিন্তু একা! ছোট বৌকে চলিতে ফিরিতে দেখিয়া বিরাজ সে দিকে নির্বিঘ্ন হইয়া পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় দুয়ারে দাঁড়াইয়াছিলেন—

সতীশকে একা ফিরিতে দেখিয়া তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন,—সাতু কই?

সতীশ ধীরে ধীরে তাঁর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—সে এলো না।

—এলোনা? কোথায় গেল?

—চলো ভেতরে বলছি।

ভিতরে আসিয়া বিরাজ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,

—তাকে আনতে পারলিনে কেন? কোথায় গেল সে?

—কি জানি কোথায় গেল! জেলের বাইরে এসে সে বললে, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। বলে সে কি কাজে গেল জানিনে; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার—

—খুজলিনে কেন?

—ঢের খুঁজেছি মা, হাট বাজার হোটেল, ইষ্টিশন, এদিক্ সেদিক্ সব জায়গায় খুঁজেছি।

সতীশ ঘরে ঢুকিয়া গেল।

বিরাজ একটি নিঃশ্বাস ফেলিল, মাখন ও একটি নিঃশ্বাস ফেলিল, কিন্তু একেবারে উল্টো কারণে; বিরাজের নিঃশ্বাসে ছিল কান্না, মাখনের নিঃশ্বাসে ছিল তাহারই বিরামের একটু স্বস্তি।

কিন্তু মাখনের প্রাণ পুড়িতেছিল—

চোখের সম্মুখে মায়ের এই ব্যাকুলতা হঠাৎ যেন তার সকল যন্ত্রণার বড় হইয়া উঠিল। ছেলেকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন তিনি, তার মূল্য তাঁর প্রাপ্য, কিন্তু সে মূল্যটিকেই অপমানিত করিয়া যে সন্তান এমন কলঙ্কের ছাপ, জাত অজাত উর্দ্ধ অধো পূর্ব উত্তর যাবতীয় পুরুষের নামের উপর দাগিয়া দিতে পারে, তাহার জন্য জননীর এই কোমলতা আর ব্যাকুলতা যেন মাখনের সংজ্ঞায় ঘা দিল। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, মা, এস; দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট ক'রে লাভ কি! অন্ধকার না হলে তিনি আসবেন না। আর, না এলেই বা এমন কি ক্ষতি?

শুনিয়া বিরাজ যেন ছাঁকা খাইয়া চমকিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, ছোট বৌ রান্না ঘরের চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; মুখ খানা যেন সকল ভাবের অভাবে রুক্ষ, বড় বৌ কাপড় ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বোধ হয় বারণ করিতেছিল; শ্বাশুরীকে ফিরিতে দেখিয়াই সে কাপড় ছাড়িয়া দিল।

বিরাজ ধমকাইয়া উঠিলেন,—সে কি কথা, বৌমা, সে করেছে কি! বেটাছেলে অমন কাজ ঢের করে। ছেলের অকল্যাণের কথা তুমি মুখে আনছ আমার সামনে দাঁড়িয়ে! এত সাহস তোমার!

মাখন শ্বাশুরীর রোষ ভ্রূক্ষেপও করিল না, বলিল,—অকল্যাণের কিছু কি বাকি আছে মা? তাঁর ফেরারী হওয়াটাই কি সকলের চেয়ে বড় অকল্যাণ?

কিন্তু বিরাজ তা বুঝিলেন না—

দেড় বৎসরের প্রথম কয়েকটি দিন সন্তানের কৃতকর্মের লজ্জায় ম্রিয়মাণ নিস্তেজ থাকিয়া, তাঁর মাতৃ-হৃদয়ে বিচ্ছেদ বেদনাই দিন দিন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।

মাখনের কথাগুলি সেই বেদনার স্থানেই আঘাত করিল; আরো তাতিয়া উঠিয়া বিরাজ বলিলেন,—শোনো, বৌমা, দেড় বছর পরে সে আসছে; সে এসে যদি তোমার আচরণে বিরক্ত হয়, তবে তোমার

ভাল হবে না। লাঞ্ছনা তোমার অদৃষ্টে ঘটবে। মিষ্টি মুখে কথা বল্‌বে; তোমার মান অভিমান আর বাঁকা কথা এখন তোলা থাক্‌...

মাখন শ্বাশুরীর মুখের দিকে নিস্পলক চক্ষে চাহিয়া রহিল।

বিরাজ বলিতে লাগিলেন, তুমি যেমন আছ তেমনি থাক; আমরা তোমার গুরুজন, আমাদের সাম্‌নে—

কিন্তু মাখন পিছন ফিরিল।

দেখিয়া বিরাজ যাহা বলিতেছিলেন, তাহা পাল্টাইয়া শেষ কথাটাই সতেজে বলিয়া দিলেন—যাও, কিন্তু সাবধান।

একটু নিঃশব্দ হইতেই সতীশ গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি, মা?

—যাই বলছি! বলিয়া বিরাজ দুঃখের আর ক্ষোভের কথা বড় ছেলের কাণে ঢালিতে উঠিয়া গেলেন—

কিন্তু সুখ পাইলেন না। এই ঘাঁটা ঘাঁটিতে সতীশের লজ্জা করিতে লাগিল; বলিল, বড়‌বৌকে বলো, সেই বুঝিয়ে বল্‌বে। বলিয়া সে মুখ নামাইল।

মায়ের তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া সতীশ ভাইকে আর একবার খুঁজিয়া আসিল, কিন্তু গম্য অগম্য ইতর ভদ্র কোন স্থানেই নিরুদ্দিষ্টের সাক্ষাৎ মিলিল না, সন্ধান ও মিলিল না।

বিরাজ মুহুর্মুহুঃ ঘর বাহির করিতে লাগিলেন। তাঁর মুখের শব্দ বন্ধ হইয়া রহিল; মুখে তাঁর ভাত উঠিল না।

কিন্তু ফলিল মাখনের কথাই!

নিতু বলিতেছিল,—কাকা কখন আসবে, ঠাকুমা? কোথায় গিয়েছে কাকা?

বিরাজ বলিলেন,—তা জানিনে।

—এতদিন কোথায় ছিল?

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া রহিলেন কথা কহিলেন না।

নিতু বলিতে লাগিল, কাকা অনেকদিন বাড়ীতে আসেনি, বড়

ঠাকুমা ? কেন আসেনি ? কোথায় ছিল এতদিন ? আমাদের জন্যে খেল্‌না আন্‌বে ?

পৌত্রের কৌতূহলের নিবৃত্তি করিবার দিকে ঠাকুমার কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না ; পরন্তু প্রশ্নগুলিতে যে মিনতি ছিল, আগ্রহ ছিল, নিজের প্রাণের সঙ্গে অন্তঃস্রোতে তার মিল থাকিলেও তাঁর অজ্ঞাতেই একবার তারা তাঁহার চোখের পাতা ভারি করিয়া তুলিল—

...মনে পড়িল না যে সবই বিসদৃশ, কিন্তু আন্‌মনা হইয়া রহিলেন।

বিরাজ আন্‌মনাই ছিলেন—

হঠাৎ চম্‌কিয়া দেখিলেন, আপাদ মস্তক কাপড়ে ঢাকা একটি লোক তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। চিনিতে তাহাকে বিলম্ব হইল না।

—সাতু ?

সাতু গায়ের মাথার আচ্ছাদন খুলিয়া মাকে প্রণাম করিল।

এবং পরক্ষণেই হৈচৈ বাধিয়া গেল—

নিতু চিৎকার করিতে লাগিল,—বাবা, কাকা এসেছে ; মা, কাকা এসেছে ; কাকীমা, কাকা এসেছে, বলিয়া কাকার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া তাহার হাত ধরিয়া নাচিতে লাগিল।

—আয়। বলিয়া বিরাজ অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার পিছন্‌ পিছন্‌ সাতু বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেখিল, তার স্ত্রী বাদে আর সবাই একত্র হইয়া সোৎসুকে দাঁড়াইয়া আছেন।...দাদাকে সে প্রণাম করিল, বৌদিকে প্রণাম করিল...দাদার ছোট ছেলেটাকে সে দেখিয়া যায় নাই। —'এটা আবার কবে হ'ল' ? জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া সাতু চুম্বন করিল।

দাদার বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না।

'আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে কোথায় পালিয়েছিলি ?' এই প্রশ্নটি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকবার তার মনে আসিয়াছিল, কিন্তু কেন পলাইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া মাকে সন্তুষ্ট করিতেও চক্ষু-লজ্জায় প্রশ্নটি না

করিয়াই সে সরিয়া গেল। বৌদিরও হেসেল ছিল ;. তিনি সেখানেই গেলেন।

বিরাজ ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—বড় রোগা হয়ে গেছিস।

সাতু নিজের গায়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—বড় কষ্ট দিয়েছে, মা ; পেট ভরে খেতে দিত না।

শুনিয়া মায়ের চোখে জল আসিল। বলিলেন,—আজ সারাদিন কি খেয়েছিস্ ?

সাতু মিথ্যা কথা বলিল, কিছুই খাইনি, মা।

—কিছুই খাস্‌নি। আহা হা হা...বলিয়া বিরাজ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

...এবং "ছোট বৌমা, রান্না হল ?" বলিয়া উত্তরের জন্য এক এক মুহূর্ত সবুর না করিয়া নিজেই রান্নার তদারক করিতে রান্না ঘরের দুয়ারে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

রান্না হইল কি না তাহা দেখিবার পূর্বেই তিনি দেখিতে পাইলেন, ছোট বৌ ব্যাধি-কাতর দুর্বল ব্যক্তির মত জড় সড় হইয়া এক কোণে দিয়ালের সঙ্গে গা ঠাসিয়া বসিয়া আছে।

বলিলেন—বড় বৌমা, রান্না হল ? সাতু সারাদিন কিছু খায়নি।

বড়বৌ বলিল,—এই হ'লো, মা। সে খুব ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

বিরাজ অবেলায় রান্না ঘরের আমিষ মাটি মাড়াইতেন না, কিন্তু এখন বড় তাগিদ ছিল ; ছোট বৌয়ের দিকে আর একটু আগাইয়া গেলেন। গলা খুব খাটো করিয়া বলিলেন,—তুমি অমন ক'রে বসে আছ যে ?

মাখন কথা কহিল না, তার মাথা মাটির দিকে আরো খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িল।

বিরাজ বলিতে লাগিলেন,—ছেলের শরীরের দিকে চেয়ে আমার মন ভাল নেই, বৌমা, এমন সময় তুমি আমায় জ্বালিও না বলছি। ওঠো।

মাখন বলিল,—উঠে কি ক'রবো ?—

—করবে আবার কি! নেচে বেড়াতে তোমায় কেউ বলছে না।
ছেলের সামনে তুমি মুখ অমন বিষ করে থাকতে পাবে না।

বলিয়া মহারাগত ভাবে মাথায় মস্ত একটা ঝাঁকি দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সাতু ইত্যবসরে তার দেড় বৎসর পরিত্যক্ত গড়গড়াটা বাহির করিয়া লইয়াছে।

কেবল তার প্রিয় তরকারীগুলি প্রস্তুত করিতে বৌদুটিকে হুকুম করিয়াই বিরাজ নিশ্চিন্ত হন নাই—সাতুর শ্রান্তিহারী তামাক-টিকেও আনাইয়া চাকরটিকে সে দিনের মত ছুটি দিয়াছিলেন।

সাতু তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল—

নিতু তার পায়ের ফাঁকে বসিয়া প্রশ্ন করিল;—কোথায় ছিলে কাকা এতদিন? বালকের ঐ একই প্রশ্ন—

কিন্তু এবারেও তার আশা মিটিল না; সাতু একটা মিথ্যা উত্তর গড়িয়া না তুলিতেই বিরাজ আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—তোর সে কথায় কাজ কিরে লক্ষীছাড়া? পালা এখান থেকে।

বলিয়া নিতুর সোহাগসুখ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে ধম্‌কাইয়া তুলিয়া দিলেন।

সাতু চির দিনই সপ্রতিভ—

নিতুর প্রশ্নে এবং ভৎ র্সনা দিয়া মায়ের এই আবৃত করিবার চেষ্টায় তার মনে ঘুণাক্ষরেও একটু বিকার উপস্থিত হইল না; বলিল,—আহা, বসুক না। বলিয়া সে নিতুকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বসাইল, কিন্তু নিতুর তখন আর খবর জানিবার উৎসাহ নাই।—

পুরুষদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেছে। মাখন নাম মাত্র দুগ্রাস ভাত মুখে তুলিয়াই উঠিয়া পড়িল। গোলাপ সেদিকে একবার বিষণ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিল; কিছু বলিল না। বহুযোজন দূরে ঝড় উঠিলে না কি সমুদ্রের নির্বাত তটেও তার ঢেউ আসিয়া লাগে।

মাখনের মনের কথা গোলাপের অজানা নাই...মাখনের বুকের বেদনা যেন নিঃশ্বাস বায়ু চালিত হইয়া তার বুকে বাজিতেছিল...তবু সে বলিয়া দিল—ভাই, আমার মাথা খাস।

বড় বৌ ছলছল চক্ষে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল।

—ছোট বৌমার খাওয়া হ'ল? বলিয়া বিরাজ আসিয়া দাঁড়াইলেন...

তাঁহার অকারণেই মনে হইতেছিল, ছোট বো যেন ইচ্ছা করিয়াই বিলম্ব করিতেছে।

বড় বৌ বলিল,—হয়েছে।

ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া বিরাজ বলিলেন,— হেসেল বড় বৌমা সারবে'খন ; তুমি যাও, শোওগে।...বলিতে বলিতে তাঁর নজরে পড়িয়া গেল, ছেলের খাওয়া থালখানা—

থালাখানা তাঁহার সাক্ষাতে তুলিয়া আনা হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি সাক্ষাতের উপর ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় সেই উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্রে বৌ ভাত লয় নাই...দেখিয়া বধূর প্রতি নিদারুণ অপ্রবৃত্তি জন্মিয়া তাঁহার যে কেমন ঠেকিতে লাগিল তাহা বলা যায় না।...কিন্তু সে কথা তিনি মোটেই তুলিলেন না ; কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—কথা বলছ না যে?

কি কথা তিনি বধূর মুখে শুনিতে চান তাহা তিনিই ভাল করিয়া জানেন না...কোথায় একটু ধিক্কার যেন ছিল, তাহাকে নির্বিষ করিতে তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষার সায় খুঁজিয়া মরিতেছিলেন...বধূর মুখের কথায় যদি তাই একটু পান ; কিন্তু মুস্কিল এই যে, গলা চড়াইবার উপায় নাই।

আরো খানিক অপেক্ষা করিয়া বিরাজ আবার বলিলেন, মনের ঝাঁঝ যেন মুখ দিয়া গলিয়া বাহির হইতে লাগিল—কথা কইছ না যে? কার হাতে তুমি পড়েছ তা জান? আমার হাতে, আমায় ঘাঁটিয়ে কেউ নিস্তার পায়নি।

বলিবার কিছু ছিল না বলিয়াই মাখন কিছু বলিল না।

বড় বৌ মধ্যস্থ হইয়া আসিল; বলিল,—তুমি যাও মা, আমি ওকে দিয়ে আসছি।

যাওয়া ছাড়া বিরাজের আর গতিই ছিল না—পাথরে আঘাত কে কত করিতে পারে।

মনে মনে ছোট বৌয়ের মাথা চিবাইতে চিবাইতে তিনি চলিয়া আসিলেন।

বড় বৌ মাখনের হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। মাখন আপত্তি করিল না—বিষে সর্বাঙ্গ ছাইয়া অবশ হইয়া গিয়াছিল।

মধুডাঙ্গার নাম মাত্র মেলা, দশ বার খানা দোকান বসে। বালতি, কড়াই প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম; আর্শি-বসান কৌট, কাঠের চিরুণী, কাঠের মালা ফিতে ঘুন্‌সী; পাঁপড় ভাজা, পান সিগরেট, আর মিষ্টান্ন··· বালকের আর গৃহস্থের ক্রেয় যা, তাহাই কেহ গরুর গাড়ীতে কেহ নিজের পিঠে চাপাইয়া লইয়া আসে।

কিন্তু সমারোহটা ভিতরেই বেশী।

রাধামাধব বিগ্রহের মন্দির, তার সম্মুখেই নাটমন্দির, তার এদিকে চত্বর, চত্বরের দক্ষিণে অতিথিশালা—সাধু বৈষ্ণবের বিশ্রাম আর ভোজনের স্থান।

সন্ধ্যা লাগিতেই কীর্তন সুরু হইয়া গেল। কিন্তু সেখানে সবাই নাই; বাহিরে গাছের তলায় স্থানে স্থানে বৈষ্ণবীগণ সহ বাবাজি বসিয়া আছেন···কেউ ইঁট পাতিয়া আগুন করিয়া কড়াইয়ে চাল সিদ্ধ করিয়া লইতেছে···ধোঁয়ায় ধূলায় স্থানটি বড় অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সবাই অলস, যে বেড়াইতেছে সে গা দুলাইয়া বেড়াইতেছে, যে বসিয়া আছে সে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আছে, যে শুইয়া আছে সে পিঠ দুমড়াইয়া হাঁটুর সঙ্গে মাথা ঠেকাইয়া শুইয়া আছে···

বাইশ তেইশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে মণিহারী দোকানে বসিয়া কাহার জন্য ঘুন্‌সী বাছাই করিতেছিল···দু'গাছা বাছিয়া লইয়া উঠিয়া

দাঁড়াইয়াই দেখিল, তার পাশেই একটা অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আছে—মেয়েটি সরিয়া গেল।

অদূরেই বিস্তৃত বাগিচা—

কেজো অকেজো ছোট বড় ঝোপ জঙ্গলে বাগিচা পরিপূর্ণ। একটা লোক একটা ঝোপের আড়ালে শৌচে বসিয়াছিল…

হঠাৎ কি দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া খানিক পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া ছুটিয়া নাট মন্দিরে ঢুকিয়া গেল…দশ বারজন লোক জুটাইয়া যখন সে অকুস্থলে উপস্থিত হইল, তখন সেই বিধবা মেয়েটি তিনটি লোকের কবলে মুখ বাঁধা অবস্থায় গোঁ গোঁ করিতেছে…যখন লোক সমাগম তারা টের পাইল তখন তারা ব্যূহের অভ্যন্তরে।

সাতু ধরা পড়িল।

তারপর মামলা, অসংখ্য যাতায়াত, অজস্র অর্থব্যয়…কত কি বিশৃঙ্খলতা ; কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনা স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট…তারপর সুদীর্ঘ সশ্রম কারাবাস…দেহের শক্তি যেন নিঙ্‌ড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়া তাহারা কাজে লাগাইয়াছে…নিদারুণ দাসত্ব—

তামাক টানিতে টানিতে সাতু অতীতকে প্রত্যক্ষ করিতেছিল—

ভাবিতেছিল, নিতান্তই দৈব, নতুবা ধরা পড়িবার ত' কোনই সম্ভাবনা ছিল না, সতর্কতা অবলম্বন করিতে কসুর হয় নাই…মেয়েটির সঙ্গ লইয়া পদে পদে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিল ; ঘুণাক্ষরেও তাহাকে টের পাইতে দেয় নাই…

দোকান পাট বন্ধ হইয়া মেলার বহিরঙ্গ নির্জন হইয়া গেল—কীর্তন তখন দুনে চলিতেছে, কীর্তন ওয়ালা ঘামিয়া নাইয়া উঠিয়াছে তবু তার বসিবার নামটি নাই। খুলী যেন নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে…মেয়েটি সিং-দরজার পিছনে অন্ধকারে বসিয়া ঢুলিতেছিল—

হঠাৎ হরিধ্বনিতেই চমকিয়া উঠিয়া সে বোধকরি গায়ে হাওয়া লাগাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল…দোকানের আওতায় বাতাস ভাল বহিতেছে না…মেয়েটি হাঁটিতে হঁটিতে গলির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তারপর যা' ঘটিল তাহা চক্ষের পলকে, মেয়েটির মুখের উপর কাপড় চাপা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহখানা শূন্যে উত্তোলিত হইয়া তীরবেগে চলিতে লাগিল—

কিন্তু বিধাতা এম্‌নি অপ্রসন্ন যে গভীর রাত্রে নির্জন বনাভ্যন্তরেও তিনি একজন সাক্ষী পূর্ব হইতেই রাখিয়াছিলেন ; সে-ই ধরাইয়া দিল... মেয়েটির মুখখানা সাতুর মনে পড়িতে লাগিল—নয়নাভিরাম ; কালোর উপর উলকির ফোঁটা...চোখ' দুটি আয়ত—সিন্দুরশঙ্খ নাই...অঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। নিতান্ত গেঁয়ো হাবা, দেখিলেই তা বোঝা যায়—মেলায় একা আসিয়াছিল, কি সঙ্গে কেহ আসিয়াছিল কে জানে !

এখন সে কোথায়—কেমন তার দশাটা—কে জানে...

ভাবিতে ভাবিতে দরজার খিলের শব্দ পাইয়া সাতু ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া দেখিল মাখন আসিয়াছে...সে মেয়েটির চেয়ে মাখন সুন্দর—

বলিল, এস।

কিন্তু মাখন স্বামীর আহ্বানে সরাসরি বিছানায় না যাইয়া দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। আহ্বান সে শুনিতে পাইয়াছে কি না সাতু তাহাই বুঝিতে পারিল না।

স্বামীর সঙ্গে মাখনের মিলনের একটা সূত্র ছিলই।—প্রাণের আঁশে আঁশে যোগের স্রোতে প্রবেশ করিয়াছিল কি না কে জানে, কিন্তু, সংসর্গজ একটা প্রীতি জন্মিয়াছিল...কোথায় ভয়াবহ দস্তপানি একজন একজন শাসক বসিয়া আছেন, তিনিও টানিয়া লইয়া একটা স্থানে জোড় মিলাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামীকে সে চিনিয়াছিল। মানুষ মানুষের হাসি দেখিয়া চেনে, ভাষা শুনিয়া চেনে, চাহনি দেখিয়া চেনে, স্পর্শ পাইয়া চেনে—চিনিবার দিকে এমন উগ্র সচেতন পরিচয় প্রাণের কাছে প্রাণের গোপন করা যেমন কঠিন, চিনিতে পারিয়া তাহার দিকে চোখ বুজিয়া থাকা ও তেমনি কঠিন...

সুখের হোক দুঃখের হোক, তবু স্পর্শ ছিল—আছে আর আছি বলিয়া নিরন্তর একটা অনুভূতি ছিল একটা আকুতি ছিল—

সেটা মাখনের বিলুপ্ত হইয়া গেছে—
মরুভূমির বালুর উপর নিপতিত জলবিন্দুর মত সে এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইয়া অদৃশ্য হইয়া আছে, তাহার উদ্দেশ নাই।

মাখন স্বামীর চোখের উপর চোখ পাতিয়া রাখিল, সে-দৃষ্টির অর্থ কি সাতু তাহা বুঝিল না; বুঝিল না যে, দুজনাই মানুষ হইলেও তাহাদের জগত বিভিন্ন...কোন জগতের অপরিচিত আত্মা এই জগতের আত্মার কাছে বন্দী হইয়া আসিয়াছে...পুরুষের দিকে স্ত্রীর এই দৃষ্টি বিভীষিকার সম্মুখে মূর্চ্ছিতার বিফল দৃষ্টি—নিঃশব্দ আর্তনাদ...

সাতু হাসিতে লাগিল—

বলিল,—বড়ই অভিমান যে! ডাকছি তা' আসা হ'চ্ছে না... ঢং দেখলাম বিস্তর। ...নেও হয়েছে, এস এখন।—না, আমায় উঠতে হবে?

মাখন চোখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া একবার ঢোক গিলিল—তার বুক ধড়ফড় করিয়া কাঠ হইয়া যাইতেছে।

সাতু উঠিতে উঠিতে বলিল,—উঃ! বলিয়া বিরক্তি আর ক্লেশ প্রকাশ করিয়া সে উঠিল...

মাখন কেবল সরিয়া যাইতে লাগিল—

কোথায় যাইতে চায়—সে জ্ঞান তার নাই...যাইবার স্থান নাই, তবু নিজেকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিয়া সে কেবল সরিয়া সরিয়া দেয়ালের বাহিরে যে অশেষ উন্মুক্ত পৃথিবী, যেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে তার স্থূল অবয়ব কেবল ত্বকের উপর পশ্চাতের কঠিন বাধা অনুভব করিতেছে—দেয়ালের সঙ্গে ঘর্ষণে তার পিঠ কাটিয়া গেল...

সাতু অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—

স্বামীর স্পর্শটা আসিয়া যেন তার সর্বাঙ্গ বিদ্ধ হইতে লাগিল—

কিন্তু দেহ-সঙ্কোচনের স্থান আর নাই...এবং পর মুহূর্তেই তার সঙ্কুচিত সর্ব্বাবয়ব যেন রুদ্ধবায়ু বাহিরের দিকে নির্গত করিয়া দিয়া বাহিরের চাপ বাহিরের দিকে ঠেলিয়া দিল...সর্বান্তকরণ বিদ্যুতের

আগুনে জ্বলিয়া লাল হইয়া প্রাণপণে দেহ বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইল। সাতু তাহা দেখিল, এমন ব্যাপার না দেখিয়া উপায় নাই; কিন্তু সাতু তাহা গ্রাহ্য করিল না—করিলে জেলে যাইত না…বলিল,—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, একটা কথা আছে না? অমন ক'রে চাইলে কি হবে!

আমায়—বলিতে বলিতে থামিয়া সাতু থমকিয়া দাঁড়াইল—মাখন হাত তুলিয়াছিল…

তুলিবার ভঙ্গীটি বড় অসাধারণ—সে যেন শুধু আত্মরক্ষা নয় তার উপরেও মারাত্মক কিছু—

সাতুর যতই ভুল হোক, এবার সে ভুল করিল না, হটিয়া আসিয়া বলিল,—মারবে না কি? মাখন বলিল,—আমায় ছুঁয়ো না।

—যদি ছুঁই?

—ভাল হবে না।

শুনিয়া সাতুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। অতিশয় তীক্ষ্ণ একখানা অস্ত্র যেন তার চোখের সামনে ঝলসিয়া উঠিল।

সাতু ফিরিল।

প্রাণভয়ে পলাইবার মত করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দড়াম করিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল,—মা?

বিরাজ জাগিয়াই ছিলেন, এক ডাকেই সাড়া দিয়া ছেলের ব্যাকুলতা কাণে বাজিতেই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন;—কি রে? কি হ'ল রে?

বলিতে বলিতে তিনি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সাতু বলিল,—বৌকে বের ক'রে আন';

ও ঘরে আমি যাব না—

মারবে বলছে।

বিরাজ ঠিক্‌রাইয়া উঠিলেন,—মারবে বল্‌ছে!—

—তা' পারে। ওর কাপড় চোপড় ঝেড়ে দেখ; ছুরি-ছোরা বোধ করি ওর কাছে আছে। শুনিয়া বিরাজ হতজ্ঞান হইয়া গেলেন—

বড় কষ্টে দীর্ঘদিন তাঁর কাটিয়াছে…উৎকণ্ঠায় তাঁর স্নায়ু

অহোরাত্র উঠিয়া পড়িয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়াছে…ছেলের ক্লান্ত শীর্ণ চেহারার দিকে চাহিয়া তাঁর কিছুই ভাল লাগে নাই …তার উপর, বধূর পিছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরক্তিতে, আর বধূর অমানুষিক আচরণে ক্রোধে তাঁর রক্ত তখনও ফুটিতেছিল।

এখন ছুরি লইয়া বধূ তাঁর পুত্রকে খুন করিতে উঠিয়াছে, আচম্কা এই খবরটা পাইয়া তাঁর মাথার হাড় পর্য্যন্ত আগুনের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল…

—কই ? বলিয়াই যখন তিনি বধূর উদ্দেশ্যে ধাইয়া গেলেন তখন তিনি উন্মাদ, হিতাহিত বুঝিবার জ্ঞান লোপ পাইয়া গেছে… চোখে পড়িল বধূ কোণে দাঁড়াইয়া আছে।

কেমন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা তাঁর চোখে পড়িল না, ছোরার ভয়ও তিনি করিলেন না…লাফাইয়া তাহার সম্মুখে পড়িলেন ঘাড় ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে আনিলেন, এবং ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই তাহাকে বারান্দায় আনিলেন, উঠানে নামাইলেন, উঠান পার করিলেন… বধূর ঘাড় হইতে হাত নামাইয়া সদর দরজার খিল খুলিলেন…

বলিলেন—যা চুলোয়। বলিয়া শেষ ধাক্কা দিয়া তাহাকে সদর দরজার বাহিরে পাঠাইয়া খিল আটিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন—

সাতু দুঃখিত ভাবে বলিল—জেলই আমার ছিল ভাল।

দ্বিতায় ঘটনা

এ ঘটনার সূত্রপাত পরক্ষ চিন্তাশীল অকৃত্রিম ত্রিলেকপতিকে লইয়া। ঘটাবলীর অসামান্য পরিণতি ঘটাইল সে-ই। কিন্তু তার চিন্তার পরিণতি প্রাপ্তির একটু ইতিহাস আছে।

সাতু মাখনের সেই ৭ই তারিখের কিছুদিন পূর্বে একদিন পায়ের চটির একটা ছুটোপাটি শব্দ করিতে করিতে সে সোজা গুরুদাসের বৈঠকখানার দরজায় পৌঁছিয়াই থম্‌কিয়া গেল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর যে উদ্দেশ্যে সে আসে আজও সে সেই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে—একটু ব্যগ্র হইয়াই আসিয়াছে; কিন্তু তার উদ্দেশ্যই সফল হইবার আশা বৈঠকখানার দুয়ারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল।

গুরুদাস আর সে এই সময়ে এখানে বসিয়া দাবা খেলে। গুরুদাস যথারীতি বৈঠকখানায় উপস্থিত আছে বটে; কিন্তু দেখা গেল একটি অপরিচিত ভদ্রলোকও সেখানে বসিয়া আছেন; শুদ্ধমাত্র ভদ্রলোক যে তিনি নন্, তিনি যে একজন অবস্থাপন্ন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তাহা তাঁহার অঙ্গ অবয়ব চোখে পড়িতেই এক নিমিষেই স্পষ্ট বুঝা গেল। বসিয়া তিনি আছেন, কিন্তু যেমন তেমন করিয়া বসিয়া নাই, এমন ভঙ্গীতে বসিয়া আছেন যাহা সহজ অথচ গম্ভীর, এবং শিষ্ট; পরিচ্ছদে একটা শুভ্র সমারোহ আছে; পরিচ্ছদ মূল্যবান্ নয়, কিন্তু শোভন। নিজেকে কি পোষাকে মানায়, বিকৃত রুচির দরুণ অনেকেই তাহা বুঝিতে পারে না; কিন্তু ইনি বেশ পরিয়াছেন বলিয়া ত্রিলোকপতির মনে হইল।

ভদ্রলোকের আগমনের কারণ, অর্থাৎ অতিথিসমাগমের ব্যাপারটা, সাধারণ নয় তাহাও ত্রিলোকপতি বুঝিল। গুরুদাসের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লণ্ঠনটি বৈঠকখানায় আনা হইয়াছে যাহা আনাইতে ত্রিলোকপতি এবং অন্যান্য বন্ধুরা রাগে চীৎকার করিয়াও পারে নাই—লণ্ঠন চুরি যাওয়ার ভয় দূর করা যায় নাই। ফরাশের ধূলিপূর্ণ সেই অনাদি শতরঞ্জির উপর পরিষ্কার চাদর বিছানো হইয়াছে; গড়গড়াটা মাজা হইয়াছে; সট্‌কাটাও নূতন; কলিকাটি সুবৃহৎ; গন্ধে বুঝা গেল, যে-তামাক আজ পুড়িতেছে তাহা নিত্যসেব্য ছ'আনা সেরের তামাক নহে—ইঁহারই তুষ্টির জন্য এবং সম্মানার্থে অধিকতর মূল্যবান বাবুভোগ্য তামাক গুরুদা। আনাইয়াছে। তাহার উপর ত্রিলোকপতি লক্ষ্য করিল যে গুরুদাস নিজে খালি গায়ে নাই, জামা পরিয়া নিজেরই বৈঠকখানায় আসিয়াছে; কেবল তাহাই নহে, সে বিশেষ উৎসাহিত কৃতার্থ এবং বিনীতভাবাপন্ন হইয়া মাত্র বসিয়া নাই, যেন অনুগ্রহ পাইবার আশায় দরবারে হাজির আছে।

ঐ সব দেখিতে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে ত্রিলোকপতির বেশীক্ষণ লাগিল না—

গুরুদাস যখন অত্যন্ত সম্ভ্রান্তভাবে বলিল, "এসো, ত্রিলোক বসো"—তার পূর্বেই সে গুরুদাসের নিজের এবং তার বৈঠকখানার এই রূপান্তর; ভালোর দিকে পরিবর্ত্তনটা, দেখিয়া লইয়াছে।

ফরাশে স্থান সংকীর্ণ বলিয়া, এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোকটিকে যথেষ্ট ব্যবধানে রাখিতে হইবে বলিয়া ত্রিলোকপতি অদূরবর্ত্তী লোহার চেয়ারখানায় বসিল, বসিয়া সে গুরুদাসের তেঁতুলে মাজা গড়গড়ার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, যেন গড়গড়ারও একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা অবশ্যই প্রাপ্য।

গুরুদাস খুব আভিজাত্যের সহিত বলিল'—ইনি রঘুনাথগঞ্জ থেকে এসেছেন, শিউলিকে দেখতে।

রঘুনাথগঞ্জের নাম ত্রিলোকপতি শুনিয়াছে, কিন্তু শিউলি ব্যক্তিটা

কে তাহা ত্রিলোকপতি ঘুণাক্ষরে জানে না ; কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সম্মুখে অজ্ঞতা প্রকাশ করা চলিবে না—বিজ্ঞভাবে বলিল, "ও"।

কিন্তু ঘটনা এই যে, শিউলি আর কেহই নয়, গুরুদাসেরই সহোদরা।

ত্রিলোকপতি এ-দেশে কর্ম্মোপলক্ষে মাত্র কয়েকমাস পূর্বে আসিয়াছে : এখানকার কোনো কোনো মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিলেও, কাহার জ্ঞাতি আত্মীয় কুটুম্ব স্বজন ভাই ভগিনী প্রভৃতি কোথায় কে বাস করে সে-খবর সে এখনো পায় নাই।

তবে রঘুনাথগঞ্জ হইতে ইনি শিউলিকে দেখিতে আসিয়াছেন শুনিয়া হাত তুলিয়া সে ভদ্রলোকটিকে নমস্কার করিল—তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন; কিন্তু কথা হইল না।

ত্রিলোকপতি একটু লাজুক স্বভাবের লোক। এদিকে চিন্তশীল আর ভক্তিপরায়ণ, এবং ওদিকে দাবার চালে প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হইলেও, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে অবান্তর কথা তুলিয়া আলাপ জমাইতে সে ভাল পারে না ; কথাবার্তায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিচারের প্রয়োজন আছে, তাহা সে মনে করে ; আবার ইহাও তার মনে হয় যে বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সমক্ষে বসিয়া কথোপকথন প্রস্তুত এবং প্রবাহিত করিবার উপযুক্ত ভাল ভাল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার কিছুই জানা নাই।

রঘুনাথগঞ্জে ইলিশ মাছ সস্তা কি না, কবিরাজী ঔষধালয় প্রচুর কি না, গঙ্গা তার কোন্ দিকে, এখানকার মতো সেখানেও পথে ধূলা যথেষ্ট কি না, ডাক দু'বেলা কি এক বেলা বিলি হয়, পাকাবাড়ীর সংখ্যা বেশী কি কাঁচা বাড়ীর সংখ্যা বেশী, বালাপোশের কারখানা রঘুনাথগঞ্জে আছে কি না, গুটিপোকার আবাদ ওদিকে কোথায় কোথায় হয়, এস্থান হইতে যাতায়াতের রেলভাড়া কতো, ইত্যাদি বিষয় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করা যাইত ; কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি বাজে কাজে এখানে আসেন নাই—গুরুদাসের পরমাত্মীয়ই, শিউলিকে দেখিতে আসিয়াছেন, এবং দায়িত্বপূর্ণ আর গুরুতর চিন্তার একটা ব্যাপার উভয় পক্ষেরই

ঘটিতে যাইতেছে; দ্বিতীয়তঃ ভদ্রলোকটির চোখের দিকে তাকাইয়া মনে হয়, ইঁহার প্রভুশক্তি অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবেচনাপূর্বক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইবে, ইহাই মনে করিয়া ত্রিলোকপতি একটা নমস্কারেই কর্তব্য শেষ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

একটা দেনা-পাওনা পছন্দ অপছন্দের দ্বন্দ্বও ভিতরে ভিতরে পীড়িত না করুক, ভিতরে আছে—চুপ করিয়া বসিয়া ত্রিলোকপতি তাহাই অনুভব করিতে লাগিল।

আগেই অনেক কথা নিশ্চয়ই হইয়াছে—

গুরুদাস এখনও খুব উদাত্ত কণ্ঠে বলিল,—আগেও আপনাকে বলেছি, আবারও বল্‌ছি, আমি দরিদ্র, কিন্তু উচ্চাভিলাষী। আপনার ছেলের সঙ্গে আমি আমার সহোদরার বিবাহ দিতে চাই, এতেই আমার উচ্চাভিলাষ কত তা বুঝ্‌বেন।

গুরুদাসের উচ্চাভিলাষের কথাটা, বলিবার ভঙ্গির দরুণ, কতক দম্ভের মতো শুনাইল; এবং ত্রিলোকপতি বুঝিয়া লইল যে, গুরুদাস ইঁহার কাছেও নির্বিবাদে খাটো হইতে চায় না।

ভদ্রলোকটি মৃদু একটু হাস্য করিলেন—

ত্রিলোকপতির মনে হইল, ইনি চট্‌ করিয়াই হাসেন না; হাসির ভাণ্ডার হইতে হাসি যেন চুয়াইয়া বাহির হয়, এম্‌নি ধীরে ধীরে হাসেন। ...বলিলেন,—বেশ। ছেলেটাকে এখনো ত' দেখেন নি'!

শুনিয়া গুরুদাস খুব মুরুব্বীভাবে একটু হাসিল; বলিল,—সে আমার দেখাই। পিসীমা যা' লিখেছেন তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয় তা' আমি জানি। আর একটি কথা—ছেলে যে আপনার!—বলিয়া গুরুদাস আনন্দে গদগদ হইয়া খানিক গা দুলাইল।

ত্রিলোকপতির মনে হইল, মানুষকে স্তবে তুষ্ট করার কৌশল গুরুদাস বেশ জানে; এবং ঐ-কথার দ্বারাই তাহা সে পরম সুষ্ঠুভাবে

করিয়াছে ; যেটুকু বাকি ছিল গুরুদাস যেন তাহা শেষ করিয়া আনিয়াছে, অর্থাৎ এ-বিবাহ হইবেই, কিছু বাদছাদ দিতে চাহিলেও রঘুনাথগঞ্জের ইনি আশ্‌কারা না দিয়া পারিবেন না।

—তামাক খান্‌। বলিয়া সেই ভদ্রলোকটি অচঞ্চলভাবে গড়গড়ার নল নামাইয়া রাখিতেই, গুরুদাস হঠাৎ যত লজ্জিত তত বিহ্বল হইয়া গেল ; গড়গড়ার উপর হইতে সন্তর্পণে কলিকাটি তুলিয়া লইয়া, এবং তাড়াতাড়ি নিজের হুঁকাটি ঘরের কোণ হইতে সংগ্রহ করিয়া ঘরের বাহিরে, অর্থাৎ বারান্দায় গেল...

সহোদরার শ্বশুর যিনি হইবেন তিনি এখন হইতেই গুরুজন বই কি !

বারকতক হুঁকা টানিয়া গুরুদাস ডাকিল, ত্রিলোক, শোনো।

ত্রিলোক শুনিতে গেল—

কিন্তু অবনত মস্তকে লোহার চেয়ারে বসিয়া তার মনে হইতেছিল, বিবাহব্যাপারে, সুকোমল শুভদ আর সুখদ বিবাহব্যাপারে, দেনাপাওনার কথাগুলি বড় কর্কশ অসুন্দর লাগে ; নানাপ্রকারের দেনা-পাওনার উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহা আদায় করা, আর, তার পৌনঃপুনিক প্রতিবাদ, মানুষের ভালো লাগার কথা নয় ; সানন্দে নয়, স্বেচ্ছায় নয় বাধ্য হইয়া, টানাটানিতে অবসন্ন বোধ করিতে করিতে, দুঃসাধ্য বিবাহব্যাপার চুকাইতে হইবে—ইহাতে মনটা বড় ধিক্ ধিক্ করে। যাহার নাম বিবাহ, অর্থাৎ দীর্ঘজীবী একটা মিলন, তাহারই সূত্রপাতে এই বাজার-দর দেখানো, আর, তা'ই কাটানো কেমন যেন কটু লাগে ; মনে হয়, বিবাহের সম্ভ্রমহানি ঘটিতেছে, তার মাধুর্যের চমৎকারিত্ব নষ্ট হইল। ...যদি এমন হয় যে, একটি ছেলে আর একটি মেয়ের ভাব হইল—বিবাহে তাহারা সম্মত হইল ; তখন তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া গেল মন্দিরে ; পুরোহিত তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া দেবতার আশীর্বাদ যাচ্ঞা করিলেন ; একাত্মকারী মন্ত্র পাঠপূর্বক তাহাদের মস্তকে নির্ম্মাল্য স্পর্শ করাইলেন ; শ্বেতচন্দনে তাহাদের ললাট

চর্চিত করিয়া দিলেন—দেবতাকে জাগ্রত জানিয়া তাঁহারই ে তাঁদের তাহারা বিবাহিত হইল। ষর,

যদি এমন হয় তবে মন্দ হয় না—অনেক দাহ জন্মেই না।

গুরুদাস চুপি চুপি বলিল,—পঁচিশ ভরি সোনা চায়; দু'ভরি কমিয়ে তেইশ ভরিতে রাজী করেছি, অনেক কেঁদে' কেটে'; হাজার এক নগদ, তার উপর খাট-বিছানা, ঘড়ি বাসন ইত্যাদি। প্রায় আড়াই হাজার কেবল দিতে হবে!

শুনিয়া ত্রিলোকপতি আর্তনাদ করিল, বলিল—বাবা!···তারপর বলিল,—তোমার সহোদরা আছে তা' জানতাম না; তা' আবার বিয়ের উপযুক্ত! বয়স হ'ল কতো তাঁর?

—পনরো চল্‌ছে নির্বিবাদে। তুমি ভেবেছ বুঝি যে তাড়াতাড়ি গৌরীদান কর্‌ছি! তা' নয়। তবে ছেলেটি ভালো, এম্, এ, পড়ে; দেখতে শুন্‌তে চমৎকার—লম্বা চওড়া সুপুরুষ পয়সাওলা। এটাকে কিছুতেই হাতছাড়া কর্‌তে চাইনে।—বলিয়া গুরুদাস হুঁকা লইয়া উঠিল।

ত্রিলোক বলিল,—আমি যাই।

—আচ্ছা, এস। কাল এস কিন্তু। আজ আর খেলাটা হ'ল না। ফলাফল কা'ল শুনো।

ত্রিলোকপতি রাস্তার জ্যোৎস্নায় নামিয়া তার বাসার দিকে চলিতে লাগিল; কিন্তু তৎপূর্বেই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেছে; ফুলের কোরকের অভ্যন্তরে যেমন পরাগ থাকে, তেম্‌নি একটি সূক্ষ্ম সুকোমল বস্তুকে চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া তার হৃদয় যেন মুদিত হইয়া গেছে······॥

পথে চলিতে ত্রিলোকপতির সেই কোরকসদৃশ পেলব অন্তরের অভ্যন্তর হইতে বিচিত্র রসস্রোত নির্গত হইতে লাগিল, অর্থাৎ সে ভাবিতে লাগিল, সর্বস্ব নগদ দিয়া কে নিঃস্ব হইতে যাইতেছে সে-কথা নয় গুরুদাসের সহোদরা শিউলির বিবাহের কথা······

ত্রিলোকপতির মনে হইল, বিবাহ অনুষ্ঠানটা বিধাতার অভিপ্রায় অনুসারে ঘটে কি না কেউ জানে না; কিন্তু ঐ অনুষ্ঠানটি যে মানুষের গভীর চিন্তার পরিণাম তাহাতে সন্দেহ নাই—কারণ, ঐ উপায়ে দুর্দান্ত অতি প্রখর বাস্তব একটা প্রমত্ততার কুৎসিত নগ্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সংযত শ্লীল পথে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সেই মুক্তিদানের কোনো প্রকারান্তর নাই। কিন্তু পুরুষ নারীকে একেবারে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ এবং তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গে ব্যাপ্ত করিয়া লইয়া যদি ভূমিষ্ঠ হইত তবে কত যে খরচ বাঁচিত তার ইয়ত্তাই নাই; জীবনের কত সমস্যার উদ্ভবই হইত না—দুর্ভাবনায় মানুষ শুকাইয়া মরিত না।

ত্রিলোকপতি নিজের রসিকতায় একটু হাসিল।

কিন্তু তা' হয় না। পশুপক্ষিগণের কি-নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় কে জানে! তাহাদের পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না; কেহ মন্ত্রপাঠ করায় না; কেবল মানুষই নিজেকে এ বিষয়ে নিতান্ত পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে তার মানে আছে। মানুষকে আবদ্ধ করা হইয়াছে সত্য, অনেক দিক্ নিষিদ্ধ করাও হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সাধুজনের পরম ঈপ্সিত একটা ক্ষেত্রে অশেষ অব্যাহিতও দেওয়া হইয়াছে—সেই ক্ষেত্রটি সনাতন, নিষ্কলুষ—অধ্যাত্ম জাগরণ দ্বারা গ্লাণিনির্মুক্ত সেই ক্ষেত্রে দেহের মিলন হয়, এবং মিলন সার্থক হয়। ইহাই সেই অধীনতার মর্মার্থ, পশুর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ঐখানে; কেবল সন্তান-সৃষ্টিই তার উদ্দেশ্য নয়, হইতে পারে না।

পুরুষ আসিয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবে। নির্বোধ ব্যক্তির হঠাৎ মনে হইতে পারে, মেয়েটির বিবাহের বয়স হইয়াছে, অতএব মন্ত্রশক্তির দ্বারা জীবনে জীবনে একটা অকাট্য গ্রন্থি দিবার অভিনয় করিয়া পুরুষটি মেয়েটিকে লইয়া যাইবে সন্তানার্থে এবং তাহার দ্বারা সুলভে এমন সব হাস্যোদ্দীপক স্থূল কাজ করাইয়া লইবে যাহার নাম হইবে স্বামীসেবা এবং গৃহ-স্থালি। অনেকেরই ধারণা, এই নিয়মেই, অর্থাৎ ধাপ্পাবাজির উপরেই, জগৎ চলিতেছে।

ত্রিলোকপতি চাঁদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল—

কি আশ্চর্য, আজও কেহ কেহ মনে করেন, এই কুসংস্কার তাঁদের আছে যে, বিবাহ আর কিছুই নয়, উভয়পক্ষেরই অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষের, জীবন যাপন বিষয়ক একটি সুবিধাজনক চুক্তিমাত্র—অন্য অর্থ টানিয়া আনিয়া যদি কেহ ভাবোন্মত্ত হন্ তবে তিনি তা' হইতে পারেন, কিন্তু ব্যাপার ঐ। পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়া স্ত্রী থাকিবেন পোষা এবং উপযুক্ত ব্যবহার আর অন্নবস্ত্র না পাইলে স্ত্রী করিবেন গোঁসা। আবার কি চাই ?

গোঁসা করিবার অনুমতি স্ত্রীকে দেওয়া আছে।

ত্রিলোকপতি আবার একটু হাসিল।

ঐ ধৃষ্ট লোকগুলির প্রজ্ঞার ঐখানেই শেষ—তার বেশী অগ্রসর হইতে তারা শেখে নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যায়, অনেকেই আছে, ভালে, পরস্পরে মিলও আছে—স্বামীর প্রতি স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামী অনুকম্পাসম্পন্ন।

তারপর ত্রিলোকপতির মনে হইল, বিবাহের এটা নিতান্তই ঘরোয়া, অপরিণত, আর রূঢ় দিক্—স্থূল উদ্দেশ্যকে সার্থক করা মাত্র; কিন্তু বিবাহের গভীর তাৎপর্যও রহিয়াছে; তাহার দিকে দৃষ্টি অধিকাংশেরই নাই, তবু তা' আছে।...স্ত্রীকে সহধর্মিনী বলা হয়—মিথ্যা বলা হয় না; স্বামী পতি ইহাও মিথ্যা নয়; বিবাহকে দৈহিক সুখের আর স্বপ্ন-সুখের দ্বারোদ্ঘাটনের মতো ব্যবহার করার মনোবৃত্তিই বেশীর ভাগ লোকের, ইহাও সত্য, কিন্তু এইটা একেবারেই ভুল—মানুষ ভারি ভুল করে, শোচনীয় ভাবে ঐখানটায় ভুল করিয়া সে বসিয়া আছে। বিবাহ ঐহিকও নয়, দৈহিক ও নয়—বিবাহ পারত্রিক এবং আত্মিক। ইহা যে মানিতে না চায় সে উৎসন্নে গিয়াছে।

বিবাহের পরই নবদম্পতির চেহারার জোলুস খুলিয়া যায় ইহা সবাই জানে। লোকে বলে, বিয়ের জলের গুণ। কিন্তু তা নয়। সত্তার গভীরতম সুখানুভূতির সঙ্গে তাহারা যে জগতে চক্ষুরুন্মীলন করে সেখানে আত্মাই কর্তা, দেহ নয়। প্রকৃতি সুপ্তির শেষে সবগুলি দল উন্মোচিত

করিয়া পূর্ণতম আনন্দে বিকশিত হইয়া ওঠে—ঐ শ্রী তাহারই, "বিয়ের জলের" নয়। উভয়ের গভীর অন্তরগত মিলন যেমন কামনাকে অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় করিয়া তোলে, তেমনি দেহকে করে সুন্দর, মনকে করে পবিত্র, আত্মাকে করে অন্তর্মুখী। কাজেই দুজনারই চেহারা হয় এমন নবীন, যেন এক রাজ্য ছাড়িয়া অন্য রাজ্যে তাহারা নূতন করিয়া জন্ম নিল। কেবল একটা লৌকিক স্থূল অনুষ্ঠানের পুনরাবর্তন ঘটে অন্তরগত কোন নবতর পরিবর্তন ঘটনা বলিয়াই দ্বিতীয় বার বিবাহের সম্মান্ নাই—শাস্ত্রেই তার মর্যাদা খুবই কম।

সংসারের যাবতীয় বিবাহিত ব্যক্তিকে এবং অন্যান্য অবুঝ লোকগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিলোকপতি অতঃপর গুরুদাসের সহোদরার কথা, তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

এ বিবাহ নিশ্চয় হইবে, এবং ইহাদের বনিবনাও নিশ্চয়ই হইবে; সবারই হাতে কুমারীর হৃদয়-অমরাবতীর চাবি নাই, তবু মেয়েটি সুখী হইবে; সবারই নিঃশ্বাসে মুকুল চোখ মেলে না, তবু মেয়েটি সুখী নিশ্চয়ই হইবে।

বন্ধু গুরুদাসের সহোদরা বলিয়া ত্রিলোকপতি শিউলির সুখাকাঙ্ক্ষা করিতেছে এমন নয়, সুখ তাহার পক্ষে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য বলিয়াই ত্রিলোকপতির মনে হইতেছে।

শুনা যায়, পুরুষ নারীর প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, নারীকে সে অবজ্ঞা করে; বর্বর যুগে পুরুষ নারীকে ভয় করিত—তার মৃদুতা কোমলতা এবং দুর্বলতাকে সে ভয়ের চক্ষে দেখিত; সে ভয় এখন অবজ্ঞায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তখন ভয় করিত কিনা নিঃসন্দেহে তা' জানা যায় নাই—এখন যে অবজ্ঞা করে ইহাও অবিসম্বাদিত সত্য নহে। পৃথিবী অন্যায় উক্তি এবং গর্হিত আচরণের দ্বারাই মৌলিক এবং উন্নত হইয়া উঠিতেছে!......আশ্চর্য!

আশ্চর্য হইয়াই ত্রিলোকপতি মেসের বাসায় পৌঁছিয়া গেল—জিজ্ঞাসা করিল,—ঠাকুর, ভাত হয়েছে?

—একটু দেরি আছে, বাবু।

—থাক্ ; একটু জিরুই। বলিয়া ত্রিলোকপতি ঠাকুরেরই খাটিয়ার উপর উঠানে বসিল…

তখন তার মনে হইল। মেয়েটি বাড়ীর ভিতরেই মানুষ হইয়াছে ; আজ পর্যন্ত বাড়ীর বাহিরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে নাই—জ্ঞান অল্প হওয়া সম্ভব ; কিন্তু ঠিক্ ঐ কারণেই অন্য দিকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে বোধ হয়। আজকাল বিবাহের পবিত্র বন্ধনের মর্যাদা মেয়েদের তরফ হইতেই সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হইতেছে না—বন্ধন শিথিল করিয়া অনেকেই আনিতেছে ; কেহ কেহ বন্ধন কাটিবার জন্য ছুরিও শানাইতেছে দেখা যায়। কোনো মেয়ে হয়তো শিক্ষায়তনের উচ্চ চূড়া হইতে অবতরণ করিয়া পাঁচ সাত বৎসর কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন, নিজের রুচি অনুযায়ী অবসরযাপন করিয়াছেন, নিজের অভীষ্টসাধনের উপায় নিজেই আবিষ্কার করিয়াছেন, জীবনের সুখোপকরণ নিজের জন্য নিজেই সংগ্রহ করিয়াছেন ; হয়তো পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে নির্দোষভাবে কিন্তু অবাধে মেলামেশা করিয়াছেন—

তাঁহাকে ধরুন বিবাহবন্ধন স্বীকার করিতে হইল…

তারপর হঠাৎ একদিন ধরা পড়িল যে, তিনি ভুল করিয়াছেন ; যাহা আশা কিংবা অনুমান করিয়াছিলেন ইহা তাহা নহে ; কর্মময় জীবনের বহির্ম্মুখী অভিসারই ভালো ছিল—এখন যেন সবই উল্‌টাপাল্‌টা অস্বস্তিকর লাগিতেছে—মনের স্বাধীন স্ফূর্তি ব্যাহত হইতেছে…

অথচ স্বামীকে তিনি ভালবাসেন ; এবং ইহাও জানেন যে, চক্ষুলজ্জা বলিয়া ভয়ঙ্কর একটা জিনিস আছে—লোকে মনে করিতে পারে, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া এ-কথা উঠিতে পারে যে, পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং শান্তি নষ্ট যে করে তার শিক্ষা নিষ্ফল, বুদ্ধি অল্প, মন দুর্বল, নৈতিক জ্ঞান নাই…

কাজেই বিক্ষোভ একটা চলিতেই থাকে, কিন্তু ভিতরে, বাহিরে

তার প্রকাশ থাকে' না। স্বামীর ভালবাসেন বলিয়াই নিজের মনের প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে আঘাত দিতে মহিলাটি চান্ না—অপ্রত্যাশিত দিকে তৎপরতা দেখাইয়া বিরোধের সৃষ্টি করিতে চান্ না—নিঃশব্দে তিনি একটি অশান্তি ও অসন্তোষের যন্ত্রনা বহন করিতে থাকেন...

এরূপ পরিস্থিতি অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ইহাদের তেমন কিছু ঘটিবে না। মাকড়সা যেমন দেহাভ্যন্তরের তন্তু বাহির করিয়া জাল প্রস্তুত করে, তেমনি ইহারা—শিউলি এবং তার স্বামী—নিজেদের অন্তরের সূক্ষ্ম সমুজ্জ্বল পরিবেশে শ্রী-অলঙ্কার-সমন্বিত করিয়া সসাগরা পৃথিবীব্যাপী একটি কাল্পনিক আবাস নির্মাণ করিবে, যাহাকে কখনো মনে হইবে কুটির, কখনো মনে হইবে প্রাসাদ, কখনো উপবন, কখনো সৈকত, কখনো উদ্যান, কখনো স্বর্গ, কখনো জ্যোৎস্নাময়, কখনো সূর্যদীপ্ত এবং সর্বদাই চমক্প্রদ আর সুখদ।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল,—ভাত দেব বাবু ?

ত্রিলোকপতি বলিল—দাও।

আহারন্তে ত্রিলোকপতি একটি সিগারেট ধরাইল ; বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া আর বালিশ লইয়া সে শুইল...

চাঁদের আলো সমগ্র বারান্দায় পড়িয়াছে—ত্রয়োদশীর চাঁদ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

শুইয়া শুইয়া ত্রিলোকপতির মনে হইতে লাগিল, রঘুনাথগঞ্জের ঐ বিশিষ্ট ভদ্রলোকটির পুত্রের সহিত শিউলির বিবাহ হইবেই ; গুরুদাসের যেরূপ আগ্রহ দেখা গেল তাহাতে মনে হয়, ক্ষতিকে ক্ষতি মনে না করিয়া এ-বিবাহ সে দিবেই ; আরো সস্তায় পাত্র কোথাও পাওয়া যায় কিনা তাহা সে অনুসন্ধান করিবে না।

কিন্তু ত্রিলোকপতি শিউলিকে দেখে নাই—সে আছে বলিয়াই ত্রিলোকপতি জানিত না। বরটি ত'-একেবারেই অজ্ঞাত—তার নামই জানা নাই। কিন্তু তাহাতে ত্রিলোকপতির বিঘ্ন কিছুই ঘটিল না ; সে

অবলীলাক্রমে এখানকার শিউলির এবং রঘুনাথগঞ্জনিবাসী·সেই যুবকটীর অনুপম মূর্ত্তি কল্পনা করিল ; পাশাপাশি স্থাপিত করিয়া নয় পৃথক ভাবে। তার মনে হইল গুরুদাসের সহোদরা শিউলি দেখিতে ভালই—ভাল না হইয়া সে পারে না, তার চক্ষুদুটি গভীর এবং বিমর্ষ—মনে হয়, বিমর্ষ কিন্তু বিমর্ষ তা নয়, কারণ, তার অন্তর বিমর্ষ নয়—আনন্দ সেখানে ছলছল্ করিতেছে ; তার চোখের ধরণই অমনি—যেখানে স্বচ্ছনীর সরসীকে বিমর্ষ মনে হইতে পারে, যদি, যে দেখে তাঁর দৃষ্টি গভীর হয়। বর্ণ খুব গৌর নয়, কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল—এত উজ্জ্বল যে মনে হয়, তার ত্বকের চেতনা আছে, স্বতন্ত্র এমন একটা চেতনা যা অপর চেতনাকে অভিভূত করে ; তার কাছে যাইয়া যে দাঁড়ায় তার মুখে চোখে চেতনাময় সেই ঔজ্জ্বল্যের সুপ্রসন্ন আভা পড়ে।...একটুখানি লম্বাটে' গড়ন—পরিপূর্ণতায় আর পরিমাণ পারিপাট্যে তার দেহের অনিন্দ্য আনন্দ·সুষমা যেন উৎসের মতো ঝরিতেছে ; গতিতে একটী মৃদু লীলা আছে—

কিন্তু কথায় তাহাকে পারা ভার—ভারী কৌতুকপ্রিয় ; ভাইপোগুলিকে অত্যন্ত জ্বালাতন করে ; বউদি'কে ঠকাইবার দিকে ও তার চেষ্টা দেখাযয়।

কিন্তু সকলের চাইতে সুন্দর সে তখন যখন সে স্নানান্তে ভিজা চুল পিঠের উপর ছাড়িয়া দেয় তখনই সে অপূর্ব্ব·কুমারী আর স্বভাবকুমারী —সুকমার আর ধৌত কুমারীদেহে জলকণা আর রৌদ্রের আভা ঝলমল্ করিতে থাকে—চোখের পাতায় জল থাকে বলিয়া চোখ বড় করুণ দেখায়।

সর্ব্বোপরি এমন একটি শিষ্টতা আর শালীনতা তার প্রত্যেকটি আচরণে আছে যার জন্য তার বাড়ীর লোকের গর্বিত হওয়া উচিত—

গুরুদাস নিশ্চয়ই গর্বিত, নতুবা সে অতো টাকা খরচ করিয়া অসাধারণ উৎকৃষ্ট পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হইবে কেন!

কিন্তু সেই ছেলেটি ইহাকে কি চোখে দেখিবে! খুব প্রেমের চক্ষে দেখিবে সন্দেহ নাই। ইহার লজ্জায়, ইহার সংকোচে, ইহার রূপে,

ইহার বাক্যে, ইহার হাসিতে, ইহার অভিমানে, ইহার গুণে—এক-কথায়, ইহাকে পাইয়া সে জীবনের স্বাদ পাইতে শুরু করিবে, এবং নিজেকে ধন্য মনে করিবে। ইহার অতি সরল অন্তঃকরণের আত্মদান হইবে অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। আর সেই ব্যক্তি, রঘুনাথ-গঞ্জের সেই যুবকটি সব এবং সর্ব্ব পাইয়াও অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিবে ঐ অন্তরের দিকে; সেই অন্তরের অপরিমেয় রহস্য হইবে তার নিরন্তর চিন্তার বিষয়, আর, নিরতিশয় তৃষ্ণার আকর্ষণ, সে সন্দেহ করিবে, ঐ হৃদয় দূরবর্ত্তী নয়, একেবারে ঢালিয়া দিয়া সমর্পণ করিয়াছে, তবু ঐ হৃদয়েরই অন্তবর্ত্তী কি একটা বস্তু সে যেন উদ্ঘাটিত করে নাই—সেবস্তুটি পাইতেই হইবে।

এই আকাঙ্ক্ষায় শিউলিকে সে আরও ভালবাসিবে; আরো কাছে পাইতে চাহিবে; কিন্তু যথার্থ ভদ্র বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া চাহিবে না। কেবল গভীর চাহনির মাদকতা নয়, দেহের সুষমা, যৌবনের উদ্দামতা নয়, তাহাকে বন্দী করিবে শিউলির মনের লাবণ্য।

মনের লাবণ্য বলিয়া একটা জিনিসকে কল্পনা করিয়াই ত্রিলোকপতির সন্দেহ হইল, মনের লাবণ্য বলিয়া কিছু আছে কি! আছে—যেমন আকাশের লাবণ্য, চাঁদের লাবণ্য, হরিৎক্ষেত্রের লাবণ্য, তটিনীর লাবণ্য আছে, তেমনি আছে শিউলির মনেরও লাবণ্য; আর, তা' অসীম, এক মুহূর্ত্ত তা লুকান থাকিবে না—মানুষটি প্রতিমুহূর্ত্তে তা' দেখিতে পাইবে সুতরাং শিউলির সঙ্গ হইবে তার আত্মার অবগাহন, কল্পনার পরিমার্জনা, আনন্দের অনুশীলন, বৈকুণ্ঠের সোপান ⋯প্রাণময় গভীরতার মাঝে তাহারা পরস্পরকে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে।

বরটি দেখিতে কেমন হইবে? কার্ত্তিকের মতো! মনে হইতেই ত্রিলোকপতির হাসি পাইল। মানুষের কি রুচি দেখ। পরিকল্পনার কি বাহাদুরি! মানুষের রূপ কার্ত্তিকের মতো! কার্ত্তিকের কথা মনে পড়িলেই যে চেহারাটা আমরা দেখিতে পাই তাহা জড়তাভাবাপন্ন; তাহাতে মানুষের মনের সে দীপ্তি কই! চোখে মুখে উদ্গ্রীবতা কই! জীবনের সদাচঞ্চল স্পন্দন কই! তবু মানুষ কিনা কার্ত্তিকের মতো! মানুষের মুখ

যে মোহ আর তন্ময়তা সৃষ্টি করিতে পারে কার্ত্তিক তা পারেন না। কার্ত্তিক যেন কর্ম সমাপন করিয়া চিরদিনের জন্য বিশ্রামে বসিয়াছেন—অতএব তিনি বিগত; তাঁর অধর জিহ্বা চক্ষু ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া কাহারো প্রাণে প্রতিধ্বনি তোলে না—যেমন মানুষের বেলায় ঘটে—বিশেষ করিয়া এই ছেলেটির যেমন করে, যার সঙ্গে শিউলির বিবাহ হইবে তার যেমন করে।

সুপুরুষ যাহাকে বলে সে তাই; আর সে অত্যন্ত প্রাণময়; আর, সে শিউলিকে অত্যন্ত ভালবাসিবে।

এইখানে ত্রিলোকপতির অলস এবং অবিরাম চিন্তায় একটু ব্যাঘাত ঘটিল—মেসের বাবুরা আসিয়া পড়িলেন।

ত্রিলোকপতিকে বারান্দায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় শায়িত দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্ত্রীলোকপতি জ্যোছ্না খাচ্ছ?

তাঁহারা ত্রিলোককে স্ত্রীলোক বলিয়া ডাকেন।

ত্রিলোক একটু হাসিল।

—ভাত খেয়েছ?

ত্রিলোক বলিল,—খেয়েছি।

—আমরাও খাইগে। ঠাকুর ভাত দাও...আজ কে হারলে?

—বাজি চটে গেছে।

—তাই বুঝি চাল ভাবছ শুয়ে শুয়ে?

—হুঁ।

বাবুরা হাত মুখ ধুইতে গেলেন।

ত্রিলোকপতি তখন ভাবিতে লাগিল, ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে—অনায়াসে অবাধে ভালবাসিবে; সে ভালবাসার তুলনা নাই; শুভ-দৃষ্টির সেই মুহূর্ত হইতে তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে—সহজাত এবং সদ্যজাগ্রত একটা ঐশী আকর্ষণ দুর্নিবার হইয়া তাহাদের সংযুক্ত করিয়া দিবে; এই আকর্ষণে স্বার্থের হাত আদৌ নাই; একই অবস্থায় নিপতিত দুইটি অসহায় ব্যক্তির মুখাপেক্ষিতা ইহা নহে; শাসিতের প্রতি শাসকের

অনুকম্পা বা অনুগ্রহ নহে; মোহ নহে; বুদ্ধি খরচ করিয়া নহে—কেবল হৃদয়ের প্রেরণায় হৃদয় দিয়া তাহারা ভালবাসিবে—সত্য অমলিন সর্বান্তঃকরণব্যাপী সেই ভালবাসা; যৌবনের উৎকণ্ঠিত কম্পমান্ চঞ্চল উষ্ণ রূপজ প্রেম নহে; ইহা সেই অভিজাত অনাদি প্রেমের স্রোত যাহা নিদ্রিত আদিম পিতা ঘুম ভাঙিয়া দেখিয়াছিলেন আদিম নারীর নিষ্পলক বিহ্বল আর অকপট চক্ষু দুটিতে। মানুষের এই ভালবাসাই সংসারকে অলৌকিক করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া ত্রিলোকপতির মনে হইল। মানুষের জীবনে আর আছে কি! এই প্রেমই তার জীবন—জীবন বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহারই সমষ্টি এই প্রেম; জীবনে যাহা কিছু উজ্জ্বল অপরূপ মনে হয় তাহা এই প্রেমেরই প্রতিবিম্ব—যাহা কিছু উপভোগ্য মনে হয় তাহা এই প্রেমের মিশ্রনেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ সংসারে বস্তু বলিয়া কিছু নাই, প্রেম যাহাকে তার মর্ম আর মধু দিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই কেবল আছে—আর সব মরীচিকা আর মায়া। লোকে বলে, প্রণয়ী প্রণয়িনীর একজন ভালবাসে আর একজন ভালবাসিতে দেয়। হয়তো এই সত্যই সাধারণ, কিন্তু তখনই পৃথিবীর পুনরাবর্তন অভিনব উৎসবময় আর রসাভিষিক্ত হইয়া চোখে পড়ে যখন দুজনাই ভালবাসিতে দেয়। ইহারা তাই দিবে—শিউলি আর তার বর।

এইখানে ত্রিলোকপতি খচ্ করিয়া একটা যন্ত্রণা অনুভব করিল: যদি তা না হয়!

কিন্তু না, তাহা হইবে না, হইতে পারে না. কারণ, দেবতা নির্মম নহেন।

সুখের ইতিহাস নাই, প্রেমেরও ইতিহাস নাই, কারণ, তার উত্থান-পতন, ভাগ্যবিপর্যয়, আদি মধ্য অন্ত নাই। ইহাদের ভালবাসার ইতিহাস কেবল এইটুকু যে, তাহারা ভালবাসে।

ত্রিলোকপতি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত অনুভব করিল যে, ইহাদের প্রেমে কলুষ থাকিবে না। কারণ, কলুষ অপ্রসন্ন, আর, জ্বালাময় ধ্বংস তার ভাগ্যে ঘটে; দ্বিতীয়তঃ কলুষের তীব্র একটা উদ্দীপনা আছে—

সেই উদ্দীপনা বেদনা বহন করে। আর, অবসাদ আনয়ন করে। সে দুর্ভাগ্য ইহাদের ঘটিবে না; ইহারা ভালবাসিবে আর মনে করিবে, আত্মার মণিকোঠায় বসিয়া দেবতা স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিতেছেন—ইহারা এ কথাটাও ভুলিবে না যে, প্রেম অর্জ্জন করা মানেই প্রেমের অনশ্বরত্ব উপলব্ধি করা।

তারপর, ইহাদের কি বিরহ ঘটিবে না? নিশ্চয়ই ঘটিবে—সংসারীর পক্ষে তা অনিবার্য, না ঘটানো চলে না। বিরহের গভীর আর্ততা তাহাদের চোখে ফুটিবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে—ত্রিলোকপতি স্পষ্টই অনুভব করিল, এই আর্ততার সঙ্গে সঙ্গে—তাহারা যে সুখ অনুভব করিবে তার সীমা পরিসীমা নাই—তখন একটা অনাহত মধ্যাহ্নের উদয় হইবে; তাহার আলোকে তাহারা দেখিবে, অন্তরের দিগন্ত পর্যন্ত অত্যন্ত উজ্জ্বল—সেই উজ্জ্বলতাকে মহিমায় মণ্ডিত আর সৌন্দর্যে পুলকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে একটি মাত্র মূর্তি; সেই মূর্তি শিউলির বেলায় হইবে সেই ছেলেটির, এবং সেই ছেলেটির বেলায় হইবে শিউলির। তাহারা তখন অধিকতর তদ্গতচিত্ত এবং অভিভূত হইয়া যাইবে। তারপর তাহারা পুনর্মিলনের জন্য উন্মত্ত নয়—উন্মত্ততা অশোভন তাহা তাহারা জানে—তাহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিবে; এবং পুনর্মিলন অমনি ঘটিবে না—হর্ষে প্লাবিত হইয়া তাহারা বন্যার বেগে ছুটিয়া আসিয়া একত্রিত হইবে।

কিন্তু বড়ই মুশকিল ঘটে, মানুষ যখন পরের মন বিশ্লেষণ করিতে বসে—নিরসংশয় হইয়াও অনুসন্ধান করিতে চায়; বিচার করিতে অগ্রসর হয় যাহা সে দিয়াছে তাহার প্রতিদানে ষোল আনাই সে পাইয়াছে কিনা। কিন্তু ইহাদের সে মতি হইবে না—কারণ, ইহারা সরল আর স্বাভাবিক আর শিক্ষিত। ইহারা জুয়াচুরি করে না, ইহাদের আত্মগোপনে রুচি নাই; পরের অন্তরের প্রতিবিম্ব নিজের ভিতর দেখিয়া ইহারা মনে করে না, সেটি নিজেরই চোখের ভুল—আত্ম বলিয়া কিছুই সে দান করে নাই। এমনি যদি কেহ মনে করে

তখন সে নিজেকে মনে করে বন্দী—বন্দীত্বের ভিতর হইতে তখন সে পলায়ন করিতে চায়; কিন্তু তাহা সত্য কেবল কৃত্রিম বিনিময়ের পক্ষে—ইহাদের প্রেমে কৃত্রিমতা নাই; যাচাই করিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র ইহারা করিতে জানে না। সুতরাং ইহারা অমর।

মানুষের প্রেমের ট্র্যাজিডি মৃত্যুতে নয়, বিরহে নয়, অবসাদে আর ক্ষুদ্রতার পরিচয়ে, আর উদাসীনতায়।

ত্রিলোকপতি মনে মনে একটু চক্র হাসি হাসিল। নিজেরই উদ্দেশে।

খারাপ হালকা আয়নার ভিতর ছায়া যেমন বিকৃত অদ্ভুত দেখায় এ-ও তেমনি, অর্থাৎ তাহার নিজের মন অতিশয় ক্রুর বলিয়া প্রেমের এই অসম্ভব বিকৃতির কথা ভাবিতে পারিয়াছে!

সে যাহা হউক, যে স্থানে ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে সে স্থান হইবে তীর্থতুল্য, সে স্থানটি কি এবং কেমন তাহা ত্রিলোকপতি আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছে—সে স্থানটি তাহাদের হৃদয়ের রাসমন্দির—এই স্থানের অনন্ত রূপান্তর কেবল তাহাদেরই কেন্দ্র করিয়া আসিবে, যাইবে, এবং আবর্তিত হইবে। ঐ স্থানটা মানুষের চোখে পড়িবে না, কিন্তু মনে জাগিবে—নির্নিমেষ অপলক হইয়া জাগিবে; মানুষের শ্রদ্ধার প্রণিপাতের স্পর্শে তাহাদের প্রেমের ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইয়া সেস্থান হইবে অক্ষয়, আর চিরবরণীয়; ধ্যানে মাত্র উপলব্ধি করার মতো একটা অশরীরী মন্দির সেখানে গড়িয়া উঠিবে; জগদতীত মূল্য তার মানুষে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না—কেবল স্মরণ করিয়া অপার্থিব রসসিঞ্চনে ধন্য হইয়া যাইবে। উচ্চারণ করিবেঃ এখানে ভালবাসা জন্মিয়াছিল, স্থিতিলাভ করিয়াছিল কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই—সুন্দরের মর্মে আর প্রকৃতির বক্ষকুহরে তাহা সঞ্চিত হইয়া আছে—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ইহাই।

এই তীর্থ আবিষ্কারের পর ত্রিলোকপতি অতিশয় মুগ্ধ হইয়া শয়ন করিতে গেল। সকাল বেলা ঘুম ভাঙিয়া দেখিল, চির-আকাঙ্ক্ষিত আরাধ্য বস্তুকে লাভ করিয়া মনটা যেন গ্লানিহীন পরম তৃপ্তির মাঝে ডুবিয়া আছে।

বৈকালে গুরুদাস বলিল,—বুড়ো ভারি ঠ্যাটা হে! কিছুতেই বাগ মানতে চায় না—কিছুতেই কমালে না। কি করি, তাতেই রাজি হয়েছি। ৭ই বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে।

ত্রিলোকপতি বলিল,—বাঁচলাম।

ত্রিলোকপতির ভয় হইয়াছিল, পাছে এই সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়। কিন্তু গুরুদাসের মনে হইল, ঠাট্টা করিল। তাহার কি দায় যে, শিউলির বিবাহের দিন স্থির হইয়া যাওয়ায় সে বাঁচিয়া গেল! সে কেমন করিয়া জানিবে যে, এই বিবাহ হইবেই মনে করিয়া ত্রিলোকপতি কত মাথা ঘামাইয়াছে, আর, হওয়াটা দেখিবার জন্য সে কত উদগ্রীব হইয়াছে। এই বিবাহটি নিষ্পন্ন হইলেই ত্রিলোকপতির তীর্থযাত্রা সার্থক হইবে। যদিও তীর্থটি অবস্থান করিতেছে নিতান্তই তার মস্তিষ্কে।

৭ই তারিখ শীঘ্রই আসিয়া পড়িল।

ত্রিলোকপতি বাজার করিল, শামিয়ানা খাটাইল, শামিয়ানার বাঁশ ভাঙিয়া আছাড় খাইল, এবং আরও কত কাণ্ড করিল তাহার হিসাব নাই। বরযাত্রিগণ আসিবার পূর্ব্বে যে গোলমাল আর খাটুনি আর ব্যতিব্যস্ততা ছিল, তাহারা আসিবার পর তাহা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল—সবাই পরিশ্রম করিতেছে, কিন্তু দেখা গেল. ত্রিলোকপতি করিতেছে সকলের চতুর্গুণ। মশলা-পেষা শিল নোড়া ধোয়া হইতে জনৈক বরযাত্রীর জন্য সেতার সংগ্রহ সে-ই করিল; বরযাত্রিদের জল পান তামাক চা দিল; বরকে বাতাস করিল। বরের বাবা সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটিকে করযোড়ে নমস্কার করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাল ছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার খবর ভাল?

কিন্তু জবাব দিবার সময় ত্রিলোকপতি পাইল না।

কে একজন চায়ে আরো-খানিক চিনি চাহিলেন—ত্রিলোকপতি চিনি আনিতে দৌড়াইল।

ত্রিলোকপতি উঠান ঝাঁট দিল, পাতা করিল, জল দিল, ইত্যাদি সে না করিল কি! সে মানুষকে খাওয়াইল, সমাদর করিল, যত্ন করিল, উৎসাহিত করিল, আপ্যায়িত করিল—একটি ভৃত্য গুরুদাসের ধমক্ খাইয়া রাগ করিয়াছিল; ত্রিলোকপতি হাতে ধরিয়া তার রাগ ভাঙাইল।

প্রীতি-উপহার বিতরণও সে-ই করিল—এবং সম্প্রদানের পর বরকন্যা বাসরঘরে গেলে ত্রিলোকপতি খালি একটা রসগোল্লা মুখে দিয়া একগ্লাস দধি পান করিল।

কৃতজ্ঞ গুরুদাস উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল,—আর কিছু খাবে না?

—না। ক্ষিদে নাই।

—অত ঘাঁটাঘাঁটির পর খেতে রুচি নেই, কেমন?

—তাই।

—বর কেমন দেখলে?

—চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার।—বলিয়া ত্রিলোকপতি তার তীর্থের দিকে চাহিল—মনে হইল, কিছুই ভুল করি নাই।

গুরুদাস বলিল.—শিউলির সঙ্গে মানিয়েছে বেশ।

—আমি তা জানতাম।

—হিতৈষী তুমি, খুশী ত হবেই।

ত্রিলোকপতি বলিল,—আসি এখন।

—এস। ভারি খেটেছ। আচ্ছা, এ-র পুরস্কার তুমি পাবে।—বলিয়া গুরুদাস পুলকিত কণ্ঠে হাসিতে লাগিল।

ত্রিলোকপতি তার মেসের বাসার দিকে চলিতে লাগিল, কিন্তু এত ক্লান্তির পরও যেন পথ দিয়া নয়, আকাশ দিয়া—চরিতার্থ হইয়া তার মনে হইতে লাগিল, আমিই পথ করিয়া দিলাম।

তৃতীয় ঘটনা

ত্রিলোকপতি একটি রসগোল্লা মুখে দিয়া একগ্লাস দধি পান করিবার পর গুরুদাসের বাড়ীর সীমানার বাহিরে আসিয়া একটি সিগারেট ধরাইল। বহুক্ষণ পরে বলিয়া সিগারেটের স্বাদ এবং ঘ্রাণ তার বড় মধুর লাগিল।

দু'খানা মোষের গাড়ী চলিয়াছে—অত্যন্ত মন্থর; গাড়োয়ান সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া নাই—মাথা গুঁজিয়া বোধ হয় ঝিমাইতেছে।

মোষের গাড়ী চলিয়া গেল—

ত্রিলোকপতি পথে উঠিল।

রাত্রি প্রায় দশটা—পথ নির্জন হইয়া আসিয়াছে, আর, জ্যোৎস্না প্রচুর।

এই জ্যোৎস্নার সঙ্গে তার মনের অনেকটা মিল ত্রিলোকপতি দেখিতে পাইল। জ্যোৎস্না প্রচুর এবং অবাধ হইলেও কেমন একটা অস্পষ্টতার আবরণ দিয়া সমস্ত বস্তুকেই যেন রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে—ক্ষুদ্রকে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে—মালিন্যকে অদৃশ্য করিয়া দিয়াছে।

জ্যোৎস্নায় কাছের জিনিষ দেখা যায়, কিন্তু পরিষ্কার চেনা যায় না—পরিচিত স্থান নূতন এবং পরিচিত বস্তু প্রহেলিকার মতো হইয়া ওঠে। দূরবর্তী জিনিষ দৃষ্টির বাহিরে আছে—একেবারে সম্মুখস্থ জিনিষের ঐন্দ্রজালিক পরিবেশ নাই; কিন্তু কাছের জিনিষ যা স্পষ্ট নয়, জ্যোৎস্নায় যার মূর্তি অভিনব হইয়া উঠিয়াছে, সে কত ভাবময় আর রস-

সংযুক্ত! তা এত বিভ্রম, বিস্ময়, আর, আনন্দ জাগায় যে, ভাবিয়া শেষ করা যায় না।

বিবাহ অনুষ্ঠান হিসাবে খুবই পরিচিত গার্হস্থ্য ব্যাপার ; প্রতি বৎসরের চার পাঁচটি মাস বাদ দিয়া বাকি সাত আট মাসে কত যে ঘটে তার ইয়ত্তাই নাই ; অথচ, আশ্চর্য দেখুন। শিউলির বিবাহোপলক্ষে একটি পরম রম্য শুচিস্মিত তীর্থ-সৃষ্টি করিবার আকুলতা ত্রিলোকপতির জন্মিল! —ব্যাপারটায় জ্যোৎস্নার প্রভাব আগা গোড়া। শিউলি সন্নিকটবর্তী অন্তঃপুরেই বাস করিত; রঘুনাথ গঞ্জের বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি, ছেলের বাবা, আসায় বিবাহের মর্ম আর পুলক আর অবিচ্ছেদ্যতা অপরিসীমভাবে সঞ্জীবিত হইয়া তাহার সম্মুখে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাহা এই জ্যোৎস্নারচিত দৃশ্যের মতো ; আছে, কিন্তু প্রকট সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি করাইয়া তাহাকে চিনাইয়া দিতে হয়।

বিবাহ হইয়া যাইবার পর ধীরে ধীরে তার সেই তীর্থ যেন জ্যোৎস্না রাত্রিতে প্রাকৃতিক পটের মতো চলতি পৃথিবীর সঙ্গে একাকার হইয়া গেল—

সুখি 'ঘরকন্না' করিতে লাগিল, সকল ভালো গল্পেরই শেষ এই।

চলিতে চলিতে ত্রিলোকপতির আলস্য বোধ হইতে লাগিল…… সম্মুখের দিকে খানিকটা দূরে কয়েকটি লোক গল্প আর হাস্য পরিহাস করিতে করিতে চলিয়াছে। হঠাৎ একটু বাতাস বাহিয়া তাহাদেরই কাহারো পরিচ্ছদ হইতে পুষ্পসারের গন্ধ ত্রিলোকের নাকে আসিল। সে অনুমান করিল, ইহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গুরুদাসের গৃহ হইতেই ওদিকে চলিয়াছে।

ত্রিলোকপতি লক্ষ্য করিল, উহারা একটা স্থানে হঠাৎ দাঁড়াইল —মাঝ রাস্তা ছাড়িয়া রাস্তার ধারের দিকে গেল, এবং একজন কাহাকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিল—

বোধ হয় পুনরায় সে-ই প্রশ্নই হইল,—কে তুমি ?

আর একজন বলিল,—কথা বলছ না যে ? তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—স্ত্রীলোক এতরাত্রে একা নির্জন রাস্তায় এসেছ কেন ? কোথায় চলেছ তুমি ?

বোধ হয় প্রশ্নগুলির কোনো উত্তর তারা পাইল না।

একজন বলিল,—চলো হে ; যে যার কাজে বেড়াচ্ছে। আমাদের কি মাথা ব্যথা ?

ত্রিলোকপতি এই সময় সেখানে পৌঁছিয়া গেল এবং স্ত্রীলোক দেখিয়া সে-ও দাঁড়াইতে চাহিল না।

ঘটনা আদৌ জটিল নয় ; এবং নিঃসন্দেহ—জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীর বক্ষে অভিসার পুলক জাগ্রত হইয়াছে ; সুতরাং পুলকপ্রবাহের পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়াইবার দরকার নাই।

কিন্তু দাঁড়াইতে হইল, তাহাকে এবং সবাইকে। ওদের একজন ত্রিলোককে চিনিতে পারিয়া বলিল,—এই যে ত্রিলোকবাবু ! চলেছেন ?

—হ্যাঁ। ব্যাপার কি ?

—আমাদের দেখে স্ত্রীলোকটিকে পাশ কাটাতে দেখে পরিচয় আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কৌতূহল হয়েছে আমাদের—আর কিছু নয়।

—চলে আসুন, যেতে দিন। বলিয়া ত্রিলোক এবং তার কথা শুনিয়া ওরা অগ্রসর হইতেই মেয়েটির মুখ ফুটিল, বলিল,—একটু দাঁড়ান, শুনুন আমার কথা।

সকলেই দাঁড়াইল—

মেয়েটি বলিল,—আমি একটি বিখ্যাত লোকের স্ত্রী। গেরস্ত বউ আমি।

—সে ব্যক্তিটি কে ?

—এখান কার একটি লোকের নারী হরণের মামলায় দেড় বৎসর জেল হয়েছিল ; জানেন ?

—জানি, জানি। মধুডাঙ্গার মেলার ঘটনা। যে জানিত সে উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল।

—সেই আসামীর স্ত্রী আমি।

—তা ঘর ছেড়ে এখানে কেন ?

—তিনি আজ ফিরেছেন। আমি তাঁকে আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে দেই নি। সেই অপরাধে শাশুড়ী আমাকে ঠেলে এনে বাড়ীর বাইরে ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

শুনিয়া ত্রিলোকপতির মনে বিবাহবন্ধনের শুচি সুপ্রসন্নতা গুরুত্ব আর দাবি-দায়িত্বের পরাকাষ্ঠা বোধ প্রভৃতি বিপুল বেগে প্রত্যাবর্তন করিল; সে যেন আহত ব্যক্তির আর্তনাদের মতো করিয়া বলিয়া উঠিল,—বিবাহিতা স্ত্রী তুমি! তাড়িয়ে দিয়েছে ? অপবিত্র স্পর্শ চাওনি; তোমার শাশুড়ী তোমার মর্ম বুঝলে না ?

—না। আপনারা সবাই দয়া করে আমাকে একটি আশ্রয় দেখে দিন।

সন্দেহ নাই যে সাতকড়ির স্ত্রী মাখন এই আশ্রয় প্রার্থিনী রমণী।

মাখন দূরে দাঁড়াইয়া ছিল—গাছের তলায়; কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে ওদের মনে হইল, বয়স বেশী নয়; আর, ইহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে লইয়া আশ্রয়দান অসম্ভব।

একজন বলিল,—ত্রিলোকবাবু কি বলেন ?

ত্রিলোক বলিল,—আমি থাকি মেসে। এক কাজ করলে কেমন হয় ?

—বলুন।

—গুরুদাসের বাড়ীতে এ-কে পৌঁছে দিলে কেমন হয় ?

—খাসা কথা বলেছেন। ব্যবস্থা হতে পারে, তাই চলুন। তোমাদের বাড়ীটা কোন দিকে ?

মাখন বলিল,—যেদিকেই হোক; আমি সেখানে আর যাবো না।

—এস। বলিয়া ত্রিলোকপতি ফিরিল, এবং তার সঙ্গে সবাই।

গুরুদাসের বাড়ীর কার্যগত হাঙ্গামা আর অস্থিরতা ততক্ষণে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; মেয়েদেরও খাওয়া হইয়াছে; প্রবীণারা উঠানে

মাদুর পাতিয়া বসিয়া শরীর ঠাণ্ডা আর বিবাহবিষয়ক আলাপ আলোচনা করিতেছেন ; তন্দ্রার আবেশে কাহারো কথা জড়াইয়া গেলে হাস্যরোলও উত্থিত হইতেছে। বরযাত্রিরা কেহ কেহ পান আর জল তখনও চাহিয়া পাঠাইতেছেন—

ও-বাড়ীও প্রায় নিস্তব্ধ—বরযাত্রিদের মশারি খাটানো হইতেছে। বাসরঘরে তরুণীগণের কলরব চলিতেছে।

গুরুদাসের চক্ষে নিদ্রা জড়াইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু বরের পিতা শয়ন না করা পর্যন্ত সে স্থানত্যাগ করিতে পারিতেছে না—আলাপ আদর তোষামোদ চালাইতেই হইতেছে।

এমন সময় বাহির হইতে একটা উচ্চ আহ্বান তার কানে আসিল, "গুরুদাস" ?

—কে ?

—আমি, ত্রিলোক। এদিকে এস একবার।

—কেন ? কি খবর ? ফিরে এলে যে ?—বলিতে বলিতে উদ্বিগ্ন গুরুদাস তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল ; বিস্মিত হইয়া বলিল,—অনেককেই দেখছি যে ! খবর কি তোমাদের ?

ত্রিলোকপতি বলিল,—এখানকার কে নারী-হরণের মামলায় জেলে গিয়েছিল জানো ?

—জানি ; সতীশ সরকারের ভাই সাতকড়ি।

—এই যে তাঁর স্ত্রী।—বলিয়া ত্রিলোক সাতকড়ির স্ত্রীর বিতাড়িত হইবার বিবরণ এবং আশ্রয় প্রার্থনার কথা গুরুদাসকে জানাইল।

গুরুদাস বলিল,—কি সর্ব্বনাশ ! আচ্ছা, থামো। কই সে মেয়েটি ?

মাখন ইহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া একটু তফাতে বসিয়া পড়িয়াছিল —খোঁজ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল ; গুরুদাস বলিল,—চলো বাড়ীর ভেতর মেয়েদের কাছে।

মাখনকে পশ্চাতে লইয়া গুরুদাস ভিতরে আসিল ; বলিল,—মা, সতীশের ভাই সাতকড়ির স্ত্রী এসেছে।

—এস, মা, বসো। এত দেরি করে এলে যে?

—নেমন্তন্ন খেতে ও আসেনি। তুমি ও-কে বসাও, আর, শোনো সব কথা। আমি আসছি। মিষ্টিমুখ করিও কিন্তু।—বলিয়া গুরুদাস ফিরিয়া আসিল, এবং ত্রিলোক প্রভৃতি সবাইকে সঙ্গে লইয়া গেল বৈবাহিকের কাছে; এরূপ অবস্থায় তাঁহার পরামর্শ এবং উপদেশ গ্রহণীয় এবং অনুপেক্ষণীয় বলিয়াই তাহার এবং ত্রিলোক প্রভৃতিরও মনে হইল।

ঘটনা অবগত হইয়া বৈবাহিক বলিলেন,—কঠিন ব্যাপার; স্ত্রীঘটিত ব্যাপার। ফ্যাসাদ বাধতে একটুও দেরি হয় না। আপনাদের উচিত, যাদের নাম করলেন, অর্থাৎ যাদের বাড়ীর বউ তাদের খবর দেওয়া, এমনকি ডেকে এনে জিম্মা করে দেওয়া।

শুনিয়া বৈবাহিকের এতাদৃশ বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হইয়া গুরুদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রহিল; বলিল,—এমন সুপরামর্শ দাতা থাকতে আমরা, কি করা যায় তারই হদিস্ পাচ্ছিলাম না।...চলো, ত্রিলোক, চলো হে তোমরা!

বরযাত্রিরাও চার পাঁচজন লাফাইয়া নামিল, এবং সঙ্গ লইল। এ-দেশ হইতে রঘুনাথ গঞ্জে গল্পের উপকরণ লইয়া যাওয়াই তাহাদের অভিপ্রায়।

দরজার খিল খুলিয়াছেন মা, অন্য কেহ নহে; শুনিয়া সতীশ নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমের আরাধনায় মন দিল; কিন্তু কঠিন হইল বিরাজের পক্ষে—ঘুমের অভাব নয়, মনের শান্তির অভাব। ব্যসনাসক্তি যাদের দেখা যায় না তারা যে শ্রেণীর ভদ্র, এরা সেই শ্রেণীর, অর্থাৎ অনভিজাত হইলেও ভদ্র পদে প্রতিষ্ঠিত; ভদ্র সমাজ বলিতে প্রকৃত অর্থে যাহাদের বুঝায় তাহাদের স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে একাসনে বসিবার অধিকার না পাইলেও একটা মর্যাদা এরা পাইত। কিন্তু বিরাজ লক্ষ্য না করিয়াছেন এমন নয় যে, সাতুর নামে জঘন্য ফৌজদারী মাম্‌লা রুজু হইয়া যাইতেই তাহাদের আসন নীচের দিকে খানিকটা নামিয়া আসিয়াছে—যাঁহারা মুখ

তুলিয়া হাসিয়া দু' একটা সহৃদয় প্রশ্ন করিতেন, তাঁহারা সেটুকু নৈকট্য যেন দেখাইতে নারাজ—এড়াইতে পারিলে এড়াইয়া যান্, সম্ভাষণ করেন না। কোন কোন গৃহিণী "সতীশের মা, কি করছ"? "বউমা, কেমন আছ"? ইত্যাদি সামাজিক তল্লাস লইয়া বাড়ীতেই অসিতেন; তাঁহারা সে সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন।

এক কথায়, এ পরিবারকে যেন একঘরে করা হইয়াছে। এ-শাস্তি সহ্য না করিয়া উপায় নাই।

ছেলে যতই দুর্বিত হোক আর অপরাধ করুক, কারাগারে আবদ্ধ অবস্থায় তার দুর্গতির একশেষ হইতেছে, ইহা ভাবিতে বিরাজের মাতৃহৃদয় কাঁদিয়াই উঠিত। সে কান্নাব মধ্যেও পারিবারিক প্রতিষ্ঠা লোপের বেদনা তাঁহাকে চিন্তাকুল পীড়িত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু তিনি আমল দেন নাই; সেটা দিতে হইল আজ—পুত্রবধূকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিবার পরই জ্বালাময় দুঃসহ ক্রোধের অন্ধকার কাটিয়া যাইতেই তাঁর মনে হইল, দুর্ণাম খুব রটিবে, মানের হানি খুব ঘটিবে।

বিরাজ উঠিলেন—

সাতুর কাছে দরবারে গেলেন, বলিলেন,—একবার দেখ্, বেরিয়ে কোথায় গেল!

সাতু স্ত্রীর অনুপস্থিতি পূরণ করিবার জন্য না হোক, ব্যস্ত মনকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত তামাক সাজিয়া লইয়াছিল, বলিল,—ক্ষেপেছ তুমি। সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ। কুল হারিয়ে আসুক ফিরে তখন দেখেনেব।— বলিয়া বাঁ হাতের তর্জ্জণীটা উত্তোলিত করিয়া রাখিল।

—কিন্তু ভারি লজ্জা পেতে হবে যে!

তর্জ্জণী সম্বরণ করিয়া সাতু বলিল,—মানুষকে মানুষ জ্ঞান কম করো; লজ্জা পেতে হবে না। ডাক্তার বদ্যি টাকা দিলেই পাবো; বাজারের মাল পয়সা দিলেই পাবো; মড়া পোড়াবার লোক গাঁজা দিলেই পাবো। অন্য লোককে দিয়ে আমাদের দরকার নেই।

—তবু একটু দেখ বেরিয়ে, যদি কাছাকাছি কোথাও থাকে।

বাক্যব্যয় অনাবশ্যক মনে করিয়া সাতু কথা কহিল না; বিরাজ নিরুপায় ব্যক্তির মতো কেবল দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"সতীশ"? উহাদেরই সদর দরজায় ঐ নাম প্রবল কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

বিরাজ, এবং সাতুরও, সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, পুলিশ—

বিরাজ সাতুর মুখের দিকে এমনভাবে তাকাইয়া রহিলেন যেন জিজ্ঞাসা করিতে চান "আবার কি করে বসেছিস্"?

কম্পিত বক্ষে উভয়ে নিঃশব্দ আর উৎকর্ণ হইয়া রহিল...সাতু ফিসফিস করিয়া বলিল,—বউই থানা থেকে লোক নিয়ে এসেছে। তোমাকে না ধরে! রাগলে তোমার হুঁশ থাকে না, চিরকাল দেখে আসছি।—সাতু অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিল।

ভয়ে বিরাজের গলা শুকাইয়া উঠিল...

আবারও ডাক আসিল সতীশকেই—সতীশের ঘুম ভাঙিয়া গেল, গোলাপেরও ভাঙিল...

পরক্ষণেই আবার ডাক—সতীশ সাড়া দিল, কে?

উত্তর আসিল: "দরজাটা খুলে একবার দেখা করো এসে"।

—যাই। বলিয়া সতীশ নামিয়া গেল, দরজা খুলিল, এবং দেখিল, সুসজ্জিত সাত আটটি সুপুরুষের পদার্পণ তাদের সদর দরজার মাটিতে ঘটিয়াছে।

গুরুদাস আগাইয়া আসিল—

বলিল,—তোমার ভ্রাতৃবধূকে তোমরা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এমন ঘুমের ভান করছ, যেন তোমাদের মতো শান্ত আর নির্দোষ লোক সংসারে নেই! সে বেচারী আমার বাড়াতে আশ্রয় নিয়েছে। আমার ভগিনীর আজ বিবাহ হল। বিশিষ্ট কুটুম্বদের সামনে লজ্জায় আমি মরে গেছি। আমার মায়ের কাছে সে এখন আছে। তোমরা তাকে আনবে, না, সেখানেই সে থাকবে?

গুরুদাস আস্তে কথা শুরুকরেনাই—গোলাপের কানে তা প্রবেশ করিল

সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া দেখিল, দেবরের ঘরে আলো আছে—

যাইয়া দেখিল, শাশুড়ীও সেখানে আছেন—

জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে, মা ?

সাতু চাপা গলায় বলিল—চুপ।

এদিকে এই মধ্যরাত্রে অতর্কিতে অযথা আক্রান্ত হইয়া সতীশের সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল—কারণ, অভিযোগ গুরুতর। গুরুদাস কণ্ঠে যেন শরসন্ধান পূর্ব্বক প্রশ্নটিকে জ্যানির্ঘোষের মতো ভয়ংকর শব্দ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

অসময়ে সদর দরজায় খিলের শব্দ ছাড়া সতীশ অস্বাভাবিক বৃত্তান্ত আর কিছুই অবগত নয়। সুতরাং সতীশ বিস্মিত হইল অপরিসীম এবং নির্বাক সতীশ যখন কথা বলিবার অবকাশ পাইল তখন সে কথায় বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করিতে পারিল না ; বলিল,—ভ্রাতৃবধূকে তাড়িয়ে দিয়েছি ? কই, আমরা তাকে তাড়াইনি ত!

ত্রিলোকপতি বলিল,—তাড়াওনি ? শুনলে কথা ! তাড়িয়েছ বই কি !

পুলিশ নয়, অন্য লোক আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়াই বিরাজ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন—বিভ্রান্ত সতীশকে নিষ্কৃতি দিলেন তিনি ; বলিলেন,—চলো, বাবা, তোমাদের কথা সত্যি।

মেয়েমানুষ বলিয়া বিরাজ কে ধমকানো ওদের আসিল না ; বলিল,—আসুন।

বিরাজ বলিলেন,—সতীশ, আমার সঙ্গে আয়।

চলিতে চলিতে বিরাজের পা ক্রমশঃ অচল হইয়া আসিতে লাগিল। যেখানে তিনি চলিয়াছেন, এবং যেখানে সেই 'হতচ্ছাড়ী' বউটি রহিয়াছে সেটা বিয়ে বাড়ী ; সেখানে লোক জমিয়াছে ঢের ; সে উপস্থিত

হওয়া মাত্রই অসংখ্য লোক ভীমরুলের মতো তাহাকে ছাকিয়া ধরিবে নিশ্চয় ; প্রশ্ন করিবে, ভৎর্সনা করিবে, বিদ্রূপ করিবে, আর হাসিয়া হাসিয়া তাঁহাদের ইতর প্রতিপন্নকরিতে চাহিবে।

নিজের এই বিপন্ন আর নিরুত্তর অবস্থা কল্পনা করিয়া বিরাজ বলিয়া উঠিলেন,—সতীশ, ফেরো ; আমি যাবো না।

—তার মানে ?—জিজ্ঞাসা করিল ত্রিলোকপতি।

সবাই দাঁড়াইয়া পড়িল—

বিরাজ বলিলেন,—আমি যাবো না ; আপনারা পারেন ত পাঠিয়ে দেবেন।

—কেলেঙ্কারীর ভয় নেই ?

—ওদের আবার ভয় ! বলিয়া গুরুদাস হাসিয়া উঠিল।

বিরাজ সত্যই গেলেন না—

সতীশকে লইয়া আসিলেন।

গুরুদাস মাখনকে মায়ের হাতে অর্পণ করিয়া গেলে গুরুদাসের মা শিবাণী তাহাকে কাছে বসাইলেন, এবং তার মুখখানা শিবাণীর এমন সুন্দর স্নিগ্ধ আর সরল মনে হইল যে, অনন্ত বাৎসল্যের উদ্রেক হইয়া তাহাকে কন্যার স্থানে বসাইতে তাঁর একটু বিলম্ব হইল না—তাকাইয়া তাকাইয়া তিনি মাখনকে কেবল দেখিতে লাগিলেন আর ভাবিতে লাগিলেন, ইহার অদৃষ্টে যে সত্যের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই নিরানন্দময় সত্যটিকে। তারপর তিনি ঘটনাও শুনিলেন—শুনিয়া তাঁর যুগপৎ ক্ষোভ আর আনন্দের সীমা রহিল না ; ক্ষোভের দরুণ তিনি বলিলেন,—আমার কাছে থাকো মেয়ের মতো, ভয় কি তোমার !...আর, আনন্দের দরুণ তাহাকে বলিলেন,—তোমার মতো মেয়ে বড়ো বেশি নেই, মা ! চলো !—বলিয়া তিনি তাহাকে বর দেখাইবার প্রস্তাব করিলেন।

মাখন বলিল,—এক-কাপড়ে আছি ; ওখানে আর যাবো না, মা।

—তা বেশ। একটু মিষ্টিমুখ করো।

মিষ্টিমুখ করাইয়া শিবানী তাহার বিছানার আর শয়নের স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

গুরুদাস আসিয়া খবর দিয়া গেল, ও-র শাশুড়ী আর সতীশকে আনছিলাম। কিন্তু তারা খানিক এসে ফিরে গেল কেন তা জানিনে। আমি শুতে চললাম, মা। ওপরে যে মেয়েরা আছে তাদের আর রাত জাগতে বারণ করো।

ত্রিলোকপতি যখন তার মেসের বাসায় পৌঁছিল তখন সে-স্থান নিস্তব্ধ—বাসার কেহই জাগিয়া নাই; স্থূলদেহ অপূর্ববাবুর নিঃশ্বাসের শব্দ বহিতেছে—মনে হয়, যেন তিনি রাত্রির বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন।

সুরেশবাবুকে ডাকিয়া তুলিয়া দরজা খুলাইয়া ত্রিলোক সবিনয়ে তাঁর মার্জনা চাহিল—তিনি হাসিয়া তা করিলেন, বলিলেন,—বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে।

জামা কাপড় ছাড়িয়া ত্রিলোক বিশ্রাম করিতে বসিল; এবং তৎক্ষণাৎ তার মনে হইল মাখনের কথা: বউটিকে স্বামী চিনিতে পারে নাই—মর্মগ্রহণে এই অক্ষমতার দরুণ সংসারে কতো অনর্থ বিপর্যয় ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বধূটির প্রকৃতি এমন যে, তার মনের গভীরতার ভিতর একটু প্রবেশ করিলেই, এবং হৃদয়ের অনুকম্পন একটু অনুভব করিলেই, স্বামী যে-আনন্দ লাভ করিতে পারিত, পরনারী হরণের দ্বারা সে-আনন্দের আভাসটুকুও পাওয়া সম্ভব নয়; মূর্খ অমার্জিত ব্যক্তিটি তাহা করে নাই—করা যাইতে পারে বলিয়া বোধ হয় সে জানেই না; ইহার ফলে সে এত ঠকিয়াছে যে, তার পরিমাণ দেখাইয়া দিলে সে হয়তো অনুতাপে সারা হইয়া যাইবে। নারীর মনের এই যে শুচিবোধ ইহা পুরুষকে কতো নিরাপদে রাখিতে পারে তাহা উপলব্ধি করিবার মতো দৃষ্টি অধিকাংশ

লোকেরই নাই; এই নারীর মন একনিষ্ঠ একাগ্র হইয়া স্বামীকে যেমন ভালবাসে তেমন ভালবাসা সংসারে অত্যন্ত দুর্লভ; ভালবাসে কি না তাহা অন্য উপায়ে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজনই হয় না।

শিউলি এবং তার বর তার কল্পনাকে সার্থক করিবে কিনা, করিতে সক্ষম হইবে কিনা, তা কেউ জানে না; কিন্তু এই বধূটি যেন তা করিয়াছে। ইহার অন্তরে শুচিতার সঙ্গে দৃঢ়তার এমন আঢ্য সমন্বয় ঘটিয়াছে যে, ইহার স্বামী ইহাকে কেবল অনুমোদন করিলেই প্রেমের সেই সুশৃঙ্খল অভিলাষিত আয়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত...

ত্রিলোকের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সে কেবল পরের কথাই ভাবে, নিজের সম্বন্ধে তার কোনো উচ্চাভিলাষ নাই। তার মনে হইল, কেমন করিয়া তা হইবে! নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া থাকাই তার স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

যখন সে সাত আট বৎসরের বালক তখন তার বাপ মা মারা যান নৌকাডুবি হইয়া—সাহায্যার্থে নৌকা আসিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিয়াছিল—কিন্তু ওঁদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সেদিনকার নদীর সেই মূর্তি আজও মনে পড়ে।

সে খুড়োর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—

কিন্তু খুড়ো মহাশয় বলিলেন, "আমার অবস্থা খারাপ; তুমি তোমার মামার বাড়ী যাও"।

মামার বাড়ী আসিলে মামা বলিলেন, "তুমি খুড়োর কাছে ছিলে, সেখানেই যাও"।

শুনিয়া সে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল—

যাহার হাতে পড়িত তাহারই শিক্ষা সে লইত, পকেটমার হইতে যোগী পর্য্যন্ত; কিন্তু দৈবাৎ পড়িয়া গেল সে একটি প্রকৃত ভদ্রলোকের হাতে; তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি বিষণ্ণতার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন; অতি অল্প কথাতেই আদ্যন্ত বলা হইয়া গেল; শুনিয়া তিনি তাহাকে তাঁর দেশে লইয়া গেলেন; ভাত আর জামা কাপড় আর বই

প্রভৃতি দিতে লাগিলেন; সে লেখাপড়া শিখিল, অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিল; কলেজের এবং কলিকাতার খরচ তিনি দিতে পারিলেন না; কাজের সন্ধান দিলেন; অর্থকর কাজ লইয়া সে নানাস্থানে বেড়াইয়াছে—তারপর এখানে আসিয়াছে।

সুতরাং তার উচ্চাভিলাষ থাকার কথা নয়।

তবু যদি একটি 'গৃহ' তার গড়িয়া ওঠে তবে কেমন হয়! গৃহ মানে বাড়ী নয়—যেখানে সে পরিপূর্ণ মাত্রায় পবিত্রতা বজায় রাখিয়া আর তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া গার্হস্থ ধর্ম পালন করিবে, সে-ই একটা স্থান—অত্যন্ত নিভৃত, নিরবগ্রহ, অনুত্তেজক, নিবিড় একটি আশ্রয়, যেখানে পথের ধূলা উড়িয়া আসিয়া পড়ে না, যে-কেহ আসিয়া ডাকিয়া জাগায় না; সেখানে থাকিবে আর একটি লোক, যে ভালবাসা দান করিবে, এবং গ্রহণ করিবে।

ঐ লোকটার পক্ষে তা সম্ভব হইত, কিন্তু অন্ধের পক্ষে যেমন দিবা ও রাত্রি সমান, ঐ লোকটির পক্ষেও তা-ই।...নাম শোনা গেল সাতকড়ি। স্ত্রীহরণের মামলায় আসামী হইয়াছিল—কারাবাস করিয়াছে। এখন দিব্যচক্ষে দেখা যাইতেছে, ইহার পূর্ব-ইতিহাস যেমনই হউক, পরবর্ত্তী জীবন বীভৎস। স্ত্রীর কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা নিশ্চয়ই করে নাই—ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া দীনতা প্রকাশ করিতে সে অনিচ্ছুক সন্দেহ নাই; কারণ, সে নিষ্ঠুর; নিষ্ঠুর লোকের চক্ষুলজ্জা থাকে না। ...াছের দেহটাকে সে দাবি করিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী তাহাকে স্পর্শ করিতে ...লল,— নাই। অতঃপর সে-ব্যক্তি নারীর সন্ধানেই ফিরিবে; কিন্তু করিবে। বাপের বাড়ী যাইবে...

কিন্তু জীবনটা তার সত্যই নিষ্ফল হইয়া গেল ...ন্ত! কাল যে কারণেই মানুষের মনের মূল শুকাইয়া যায়—সে বিচি মৃতের মতো অসাড় এবং অসাড় অবস্থায় দেহব ...; কিন্তু জাঁকালো অবিশ্বাস করিতে থাকে। ...য়ছ?

নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় ত্রিলোকপতি জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল

চাহিয়া চোখ দুটিকে যেন ঠাণ্ডা করিয়া লইল ; তারপর যাইয়া শুইল।

এবং তাহার ঘুম ভাঙিল সকাল আটটায়, গুরুদাসের প্রেরিত লোকের ডাকাডাকিতে ; গুরুদাস চিঠি পাঠাইয়া দিয়াছে ; লিখিয়াছে ; "আজ কুশণ্ডিকা, বরভোজন। তোমার নেমন্তন্ন। অনেক কাজ। গা-ঢাকা দিলে চলবে না। চান করেই চলে এস তুরন্তেই। বরের বাবা তোমাকে খুব খুঁজছেন"।

ত্রিলোক লিখিয়া দিল : "চায়ের জল চাপাও। যাচ্ছি"।

সকালবেলা এই নূতন মানুষটিকে দেখিয়া গুরুদাসের অন্তঃপুরে জিজ্ঞাসার অন্ত রহিল না। সকলে অবাক হইয়া গেল তার আশ্চর্য রূপ দেখিয়া। মাখনের রূপ উজ্জ্বল নয়, কিন্তু ভারি আকর্ষক ; এমন একটি পারিপাট্যের আভাস তার সমগ্রতার শোভা সম্পাদন করিয়া ফুটিয়া আছে, আর, তাহারই ছন্দানুগমন করিতেছে, যা অনির্বচনীয় বলিলে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না। মানুষটি আকারে ঠিক পরিমাণ মতো—মনে হয় না যে, পুতুলটি ; আর, এমন একটা স্থৈর্য এক নিমেষেই চোখে পড়ে যে, তন্বী বলিয়াই তাহাকে তুচ্ছ মনে করা চলে না।

শিউলি দুহাতে তাহার দুহাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তোমাকে বড়ো ভাল লাগছে আমার।

মামার মাখন হাসিয়া শিউলিকে বলিল,—সুখী হও।

মাম।খনকে লইয়া বেশি ঘাঁটাঘাটি হইল না—ভদ্রভাবেই তার পরিচয়

সেখানেই যাও ঢুইয়া গেল।

শুনিয়া সে রা শিবানী গোপনে বলিলেন,—ঢের কাপড় পেয়েছিস্।

যাহার হাতে প ক।

যোগী পর্য্যন্ত ; কিন্তু দিল।

হাতে ; তাহাকে কি ষ্টত হইয়া গেল ; বলিল,—আমি আপনাদেরই পোষ্য

করিলেন ; অতি অল্প

তাহাকে তাঁর দেশে ন মাকে 'তুমি' বলে তেমনি তুমি আমাকে তুমিই

বলো। পোষ্য হলে বলছ? হলে ক্ষতি নেই। শুভদিনে আশীর্বাদ করলাম।

শুনিয়া শিউলি হাসিতে লাগিল।

মাখন তার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিল; এবং শিবাণীর পদধূলি আর আশীর্বাদ গ্রহণ করিল।

এদিকে পায়ের চটির লুটোপাটির শব্দ করিতে করিতে ত্রিলোকপতি আসিয়া পড়িল—বরের বাবাকে নমস্কার করিল সর্বাগ্রে, এবং তাঁর শরীর ভাল আছে কি না, অকপট উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাহা জিজ্ঞাসা করিল; ভাল আছে শুনিয়া সে এত আনন্দিত হইল যে, তার সমস্ত শরীরে সে আনন্দ ব্যাপ্ত হইয়া গেল; বরযাত্রিগণের চাহিদা মিটিয়াছে জানিয়া সে অধিকতর চরিতার্থ হইল—তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেল ভিতরে গুরুদাসের সন্ধানে—

যে গুরুদাস বলিয়া ডাকিতেই যে-বউটি আলুর খোসা ছাড়াইতেছিল, এক মুহূর্তের জন্য সে মুখ তুলিয়া তাকাইল।

শিবানী বলিলেন,—এসেছ, বাবা ত্রিলোক! কুশণ্ডিকার সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকেই। গুরুদাস বলে গেছে, তুমি তার জন্যে একটু অপেক্ষা করো। ঠাকুরের কাছে সে কি যেন জানতে গেছে।

ত্রিলোক বলিল, বেশ। মোচার ঘণ্ট হবে বুঝি?

মোচা লইয়া বসিয়াছিল শিউলি, বলিল,—হ্যাঁ, ইলিশ মাছের মুড়ো-কাঁটা দিয়ে। তারপর ঠিক ছেলেমানুষের মতো বলিল,—এ বউটিকে চিনতে পারলেন, ত্রিলোকদা?

—না।

শিউলি হাসিয়া উঠিল,—খাসা লোক আপনি ত! কাল যে আপনারা একেই এনেছেন!

—তাই নাকি! অনুমান হয়তো তাই করলাম; কিন্তু জাঁকালো কাপড় দেখে ভুল করে ফেলেছি। কাজে বসিয়ে দিয়েছ?

—হ্যাঁ। আমাদের করে নিয়েছি।

—সুন্দর তোমরা।...আচ্ছা আমি বসছি গিয়ে। জলখাবার আর চা পাঠিয়ে দাও—ক্ষিদে পেয়েছে যাচ্ছেতাই। —বলিয়া ত্রিলোকপতি বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল।

একদিনের কাজের ধাক্কাতেই ত্রিলোকপতি 'ঘরের লোক' হইয়া উঠিয়াছে; সে এখন শিউলির 'ত্রিলোকদা', গুরুদাসের স্ত্রীর 'ঠাকুরপো', গুরুদাসের মায়ের 'বাবা ত্রিলোক', এবং গুরুদাসের ছেলেদের 'কাকা'।

সে যাহাই হউক, গুরুদাস কুশণ্ডিকা সম্বন্ধে ঠাকুরের আরো কিছু উপদেশ লইয়া আসিল। ত্রিলোককে সঙ্গে লইয়া জলযোগান্তে গেল বৈবাহিকের সমীপে; তাঁহার নিকট হইতে কিয়ৎক্ষণ অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি লইয়া এবং আপন লোকের মতো বিনা দ্বিধায় ফরমাশ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আদায় করিয়া লইবার প্রার্থনা তাঁহাকে এবং অন্যান্য সবাইকে জানাইয়া গুরুদাস গেল মাছ দুধের বাজারে; ত্রিলোক গেল কুশণ্ডিকার জন্য বিবিধ দ্রব্যের সন্ধানে।

কুশণ্ডিকা সমাধা হইল।

বর প্রভৃতির ভোজনোৎসব উত্তীর্ণ হইল।

শিউলি বরের সঙ্গে সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হইয়া গেল। ত্রিলোকপতি স্টেশন পর্যন্ত বরপক্ষীয় ভদ্রমহোদয়গণের প্রত্যুদগমন করিল, এবং বশংবদভাবে এত বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিল যে, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া গেলেন, আর, বলিলেন, আপনাকে আমরা ভুলতে পারবো না।

শিউলি গোপনে মাকে বলিয়াছিল, "মাখনদি যদি আমার সঙ্গে যায় তবে কেমন হয়, মা" ?

মা বলিয়াছিলেন, "সে পরের বউ ঝি। তাদের না জানিয়ে হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিই কি করে!"

শিউলি অশ্রুমোচন করিতে করিতে মাখনেরও হাত ধরিয়া বিদায় লইয়া গেল।

চতুর্থ ঘটনা

দ্বিরাগমনের পর হইতে শিউলি রঘুনাথ গঞ্জেই আছে।

তাদের, শিউলির এবং তার বরের সম্বন্ধে ত্রিলোকপতির সচেতনতা আর বায়বীয় নহে। চোখে দেখা মানুষ আর কল্পিত মানুষ একই গুণ সম্পন্ন নহে। ওদের উভয়েরই স্বাস্থ্য ত্রিলোক স্বচক্ষে দেখিয়াছে; তাহাদের বয়সের অনুপাত প্রফুল্লকর, তাহাও সে অনুভব করিয়াছে; আর, সে অনুমানকরে, তাহারা একই চিন্তায় অহোরাত্র বিভোর হইয়া আছে। দেহ তাদের পরম ঐশ্বর্য; রক্তের কল্লোল তারা কান পাতিয়া শোনে, হৃদ-পিণ্ডের নৃত্য তারা চোখ বুজিয়া দেখে, আর সুখে, আর মুখোমুখি হইয়া তারা এত হাসি হাসে যে, সারা আকাশে তত হাসি নাই। তাহারা এখন জীবন সম্ভোগ করিতেছে, আর মনে করিতেছে, জন্ম গ্রহণ ভালবাসায় সার্থক হইল। এখন তাদের পৌর্ণমাসী—জলোচ্ছ্বাস উভয় তট প্লাবিত করিয়াছে। এখন আনন্দ উদ্বেল হইয়া আগে আসে ধ্যানে, তার পরে আসে দেহে। উহা হইবেই, কারণ, প্রেমগঙ্গার দেহই গোমুখী—তীর্থ-সৃষ্টির দেহই বনিয়াদ, প্রথম উপাধি, প্রধান উপচার, অর্থাৎ সাধনার প্রথম স্তর।

ত্রিলোকপতি এবং গুরুদাসের দাবাখেলা চলিতেছে। গুরুদাসের তিন বছরের ছেলে হারু মাখনের এমন ন্যাওটা হইয়াছে যে, মাকে ডিঙাইয়া সে মাখনকেই চায়।

এ বাড়ীতে মাখনের মন বসিয়াছে বেশ। বিরাজ তার আর সংবাদই লন নাই; কিন্তু তাহাতে মন খারাপের কারণ কিছুই হয় নাই।

পাখীর ভয় ঘুচিলে যেমন মানুষের হাত হইতে খাদ্য তুলিয়া লয়, মাখনের মনের অবস্থা তেমনি অকুতোভয় হইয়া আছে। ইহারা অত্যন্ত শিষ্ট, সহৃদয় আর উৎফুল্ল; মানুষকে স্নেহ স্বাচ্ছন্দ্য আর অধিকার দিয়া তাহাকে অসংকোচ আর নির্মল করিয়া তুলিতে ইহারা জানে।

মাখন অসংকোচে ঘরে দুয়ারে যেখানে সেখানে বেড়ায়; এমন কি হারুকে কোলে লইয়া যাইয়া দাবা খেলা দেখিতেও দাঁড়ায়। সে বোঝে না কিছু—কি উদ্দেশ্যে উহারা ঐ বিবিধ আকারের রঙিন কাষ্ঠখণ্ডগুলির স্থান পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করিয়া দিতেছে!

হারু বলে, "নেব"।

মাখন বলে, "দেবে ত নাইই; উপরন্তু মারবে"।

শুনিয়া ছকের দিকে চোখ রাখিয়াই গুরুদাস হাসে, ত্রিলোক ও হাসে।

মাখন জল আনিয়া দেয়; কিন্তু যখন আসে তখন হারুকে লইয়াই আসে।

সেদিন ত্রিলোক আসিয়া দেখিল, বৈঠকখানার দরজা বন্ধ। ডাকিতেই মাখন আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল; বলিল,—তিনি বাজারে গেছেন; বসুন আপনি। বলে গেছেন, আপনি এলে বসাতে। তাঁর ফিরতে দেরি নেই।

ত্রিলোক মাখনের মুখের দিকে তাকাইয়া কথাগুলি শুনিল; জিজ্ঞাসা করিল, মা কই?

—তিনি আহ্নিক করছেন।

—বউদি?

—তিনি রান্না চাপিয়েছেন।

—তুমি না এলে ত ফিরে যেতেই হত।

—আসব না কেন! সব পুরুষই ত নারীহরণ করে না!—বলিয়া মাখন হাসিল; কিন্তু হঠাৎ তা চোখে পড়িয়া ত্রিলোকপতির মনে

হইল, হাসাটা মাখনের উচিত হয় নাই, যদিও হাসিটা মধু ছিটাইয়া দিয়াছে।

বলিল,—আমি বসছি ; আসুক সে।—বলিয়া ত্রিলোক লোহার চেয়ার একখানা টানিয়া লইয়া বারান্দায় বসিল। জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার কতদিন হল বিয়ে হয়েছে ?

—বছর আড়াই।

—আড়াই বছর কেমন ছিলে ?

মাখনের মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল ; বলিল,—ভালো না। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

চেয়ারে বসিবার পর, এবং মাখন চলিয়া গেলে ত্রিলোকপতির মনে হইল, স্বামীকে উদ্দেশে বিদ্ধ করায় ভাবিতে পারা যায় যে, স্বামী আখ্যাযুক্ত মানুষটিকে মাখন মনে মনে একেবারে খারিজ করিয়া দিয়াছে ; আপন জন হিসাবে তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য থাকিলে মাখনের মুখে হাসি ফুটিবার পক্ষে সেইটাই হইত বাধা। আড়াইবৎসর তার বিবাহ হইয়াছে—আড়াই বৎসরই সে ভালো ছিল না, অর্থাৎ সহজ আনন্দের সুর বাজে নাই—রসাবেশে বিভোর হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মাল্য রচনা আর দান প্রতিদান চলে নাই—বরণ ডালায় পুলকের শিহরণ বহে নাই—উচ্ছলতার আবির্ভাব সে অনুভবই করে নাই—অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছে, দিকসীমানা পর্যন্ত মরুর মতো রিক্ত, অগ্নি নিঃশ্বাসে জর্জরিত, অভাব বিধুর।

ভুগিতে ভুগিতে সে স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছে।

এই ত্যাগের কথায় ত্রিলোকপতির মনে হইল, এমন হাস্যোদ্দীপক প্রহসনও সংসারে ঘটে, আর, তা মানুষের সমর্থন পায়! সাতকড়ি স্ত্রীকে গ্রহণই করে নাই—যদিও সাতটি পাক ঘুরিয়া গেছে, মালা বদল হইয়াছে, গাঁটছড়া বাঁধা হইয়াছে, যজ্ঞধূমের কজ্জল তিলক পরানো হইয়াছে, মন্ত্রপাঠপূর্বক সম্প্রদান করা হইয়াছে, দেবতাকে আহ্বান এবং সাক্ষী করা হইয়াছে ; অনুষ্ঠানের কোথাও ত্রুটি অপূর্ণতা ঘটে নাই,

তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হইল না বলিয়াই লোকে মনে করিয়াছে, স্ত্রী-গ্রহণের কৌশলগুলি পুতুলনাচের পালার মতো ক্রমান্বয়ে অভিনীত হইয়াছে, এবং হাজার লোকে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে, তথাপি সব ব্যর্থ হইয়াছে কেবল এই কারণে যে, পুরুষটি মন্ত্রের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে নাই, প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই, গোত্রান্তরিত করিয়া স্ত্রীগ্রহণের তাৎপর্য তার ধারণাতেই আসে নাই—তখনও না, তার পরেও না।

তাহা হইলে এই বিবাহকে কেমন করিয়া বিবাহ বলা যায়। নিষ্ফল ব্যাপারটার সমগ্রতা এমন প্রত্যক্ষ আর তার পরিসমাপ্তি এমন চূড়ান্ত যে, কেবল কারো কি কিছুর দোহাই পাড়া আর চলে না যেন!

মাখনের মুখখানা ত্রিলোকের মনে পড়িতে লাগিল; আড়াই বছরের স্মৃতি তাহাকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

—যত শীগগির ফিরবো মনে করেছিলাম তা হয়ে উঠল না। তিন দোকান ঘুরলাম এক জোড়া পছন্দসই কাপড়ের খোঁজে। বসো। আসি।—বলিয়া গুরুদাস একটু দাঁড়াইয়াই ভিতরে গেল।

দিন তিনচার পর ত্রিলোকপতি আসিয়া দেখিল, বৈঠকখানার দরজা খোলা, লণ্ঠন জ্বালা রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ কেউ নাই।

ত্রিলোক ধীরে ধীরে ভিতরে গেল—

শিবানী সন্ধ্যা সারিয়া তখনই উঠিয়া আসিলেন; বলিলেন—গুরুর বড়ো জ্বর হয়েছে, বাবা; ওপরে আছে।

—ম্যালেরিয়া?

—বোধ হয়, খুব ঝাঁপিয়ে জ্বর এসেছে।

—তার কাছে একবার যাবো মা?

—যাবে বই কি। এখন কেমন আচ্ছন্ন ভাব। কিন্তু কাঁপতে কাঁপতেও সে বারবার বলেছে, ত্রিলোক এলে এখানে আসতে বলো।—বলিয়া শিবানী লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইলেন।

গুরুদাসের স্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল—

মাখন বসিয়া রহিল ; রোগীর কপালে জলপটি বসানো আছে— মাখন তাহাতে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতেছে।

"বসো"।—বলিয়া গুরুদাসের স্ত্রী টুল আগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শিবানী বলিলেন,—মাখন যা সেবা করছে, বাবা। দেখে বড়ো ভালো লাগছে।···এই বউকে যারা কষ্ট দিয়েছে তারা নিজের পায়ে কুড়োল মেরেছে।

—কিন্তু, মা, আমি একটা কথা বলি।—বলিয়া গুরুদাসের একখানা হাত টানিয়া লইয়া ত্রিলোক ধীরে ধীরে তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিল।

—কি কথা বলবে ?

—আমার যা বিশ্বাস তা-ই বলব, মা। হয়তো অন্যায় শোনাবে ; আমার অপরাধ নেবেন না। এই বউটির ওরা কেউ নয় ; কোনো সম্পর্কই স্থাপিত হয়নি। বিয়ে ত কেবল সামাজিক ব্যাপার নয় ; আত্মা নিয়ে তার প্রথম আর প্রধান কারবার। আত্মা চায় ভালবাসা ; আর ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে ; তার সেই ক্ষুধা মেটাতে তাকে একটা ঠাঁই দেখিয়ে দেওয়াই হচ্ছে বিবাহ। তাই, দীর্ঘদিন ধরে যদি প্রাণের আসনে ঠাঁই না হয় তবে সে বিবাহ বিবাহ নয়।

—কিন্তু আমরা ত তা ভাবতে পারিনে, বাবা। যা চলতি তাই আইন আর অকাট্য। অমান্য যদি করি তবে পাপ না হোক, সমাজ ব্যবস্থায় ছিদ্র করার জন্যে দায়ী হতে হবে। আর,···

গুরুদাস যন্ত্রণার শব্দ করিয়া হাঁ করিল—মাখন তার মুখে জল দিল ; পটির জল নিংড়াইয়া আবার ভিজাইয়া কপালে বসাইয়া দিল।

কিন্তু বিবাহ সম্পর্কিত কথা আর অগ্রসর হইল না—শিবানী চলিয়া গেলেন।

রোগীর দিকে চাহিয়া মাখন নিঃশব্দে বসিয়া ছিল ; একবার মুখ তুলিয়া দেখিল, ত্রিলোক তাকাইয়া আছে।

ত্রিলোক মাথা নামাইয়া নিঃশব্দে কি ভাবিতেছিল ; একবার মুখ তুলিয়া দেখিল, মাখন তাকাইয়া আছে।

হঠাৎ ত্রিলোক বলিয়া বসিল,—সংসারে অসংযম চিরকাল নিন্দা পেয়ে এসেছে। পিতামাতার অসংযম সন্তানের মনে প্রবৃত্ত হয়। তোমার কথা ছেড়ে দিলাম; কিন্তু ধরো যদি সন্তান হত। তার মতো নিরর্থক অযাচিত ব্যাপার, একদিকে হাস্যকর অন্যদিকে হৃদয় বিদারক ঘটনা, কিছু হতে পারে কি। সে সন্তান হত কলুষজাত; সাপের যেমন বিষদাঁত থাকে, পুরুষটির অন্তরে তেমনি একটি জ্বালাময় প্রবৃত্তি আছে—আর কিছু নেই, কেবল আছে ঐটি; সেই সন্তান হত প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির অভিজ্ঞান মাত্র; বিবাহিতা পত্নীর গর্ভের সন্তানের যে মূল্য থাকে তার সে মূল্য থাকত না—কারণ, যে অনশ্বর অমৃত বস্তুর আধার হিসাবে সন্তান নিত্য আর নিরঞ্জন, সে বস্তুর স্বাদ তুমি পাওনি; আত্মার আনন্দে যে সন্তানের উদ্ভব হয়নি তাকে কি মনে করা যায় যে, প্রেম যেন স্বর্গ থেকে রূপায়িত হয়ে কোলে এসেছে?

মাখন আরক্তমুখে বলিল,—আপনার সব কথা আমি স্বীকার করি।

--করো! তবে উঠে এস।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাখন উঠিয়া আসিল।

"এস আমার সঙ্গে"। বলিয়া ত্রিলোক তাহাকে নামাইয়া আনিল।

বলিল,—মা, মাখনকে নিয়ে আমি একেবারে দেবালয়ে চললাম।

—কেন?

—কাজ আছে মা। আপনি একটু গুরুদাসের কাছে গিয়ে বসুন। ঘুমুচ্ছে সে। এখনি আমরা ফিরব।

শিবানী বলিলেন,—আচ্ছা, এস।

তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় গুরুদাসের রোগনিবৃত্তি কামনা করিয়া ওরা চরণামৃত আর নির্মাল্য আনিতে গেল।

ত্রিলোক আর মাখন যখন দেবালয়ে পৌঁছিল তখন গোপীবল্লভ বিগ্রহের সন্ধ্যারতি শেষ হইয়া গেছে—দর্শকগণ চলিয়া গেছে।

হাত ধরাধরি করিয়া ওরা বারান্দায় উঠিয়া গেল। বিগ্রহের দুই পার্শ্বে মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছে; গোপীবল্লভ পাথরের; রাধিকা মূর্তি

পিতল নির্মিত। ফুলের গন্ধ নাকে আসল; মূর্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ত্রিলোকপতি দুই মুহূর্ত্ত ধ্যানস্থ হইয়া রহিল।

পূজারীকে ডাকিয়া পাঁচটি টাকা প্রণামী দিল; উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

ত্রিলোক বলিল, ঠাকুর আমাদের কপালে শেষ দিনের ফোঁটা দিন।

ঠাকুর তা দিলেন।

ত্রিলোক বলিল,—বলো, দেবতা সত্য।

মাখন বলিল,—দেবতা সত্য।

—ধর্মের বিগ্রহ ইনি।

—ধর্মের বিগ্রহ ইনি।

—সমুদয় সৃষ্টি ইঁহার।

—সমুদয় সৃষ্টি ইঁহার।

—আমাদের অন্তর এই দেবতা নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন।

—আমাদের অন্তর এই দেবতা নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন।

—ইঁহার গোচরে আমরা বিবাহিত হইলাম।

—ইঁহার গোচরে আমরা বিবাহিত হইলাম।

—চিরকাল প্রেমদান করিব।

—চিরকাল প্রেমদান করিব।

—আত্মাই ভগবান—ভগবানই আত্মা।

—আত্মাই ভগবান—ভগবানই আত্মা।

—ওঁ শান্তি। বলিয়া চরণামৃত আর নির্মাল্য চাহিয়া লইয়া ত্রিলোক তার নিজের আর মাখনের মস্তকে স্পর্শ করাইল।

বলিল,—এস। বলিয়া মাখনের হাত ধরিল; তারপর তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল।

সমঝদার

সচল সবাক্ ছায়ায় ফুটেছে অনবদ্য হয়ে চির সবুজের সমারোহ—"আহরণ"।

শ্রেষ্ঠাংশে রাতুল বক্সী, জগন্নাথ দে, জ্ঞানদা ওরফে গুনু, মানসী দেবী, মানিনী রায়, প্রতাপ গুপ্ত...

শুনে পুলকে গা শিউরে ওঠে।

শ্রেষ্ঠাংশে এঁরাই দেখা দিয়ে থাকেন, ১৫১ বার দিয়াছেন, কিন্তু পুরণো হন্ নাই। এ কথাও কি মানুষকে বলে দিতে হবে যে, প্রতিভা নিজেকে কদাচ পুরণো হ'তে দেয় না! শ্রেষ্ঠাংশের শ্রেষ্ঠত্ব ওঁরা ক্ষুন্ন হ'তে দিতে পারেন না। কে না জানে, ওঁরা মায়াবী আর মায়াবিনী—যাদু জানেন, দুরতিক্রম্য আর চির-সজীব প্রতিভার যাদু; ভিখারী, ভক্ত, ভীরু থেকে বৈকুণ্ঠের ভগবান্ পর্য্যন্ত ওঁরা সমান তালে সাজ্তে জানেন—ভিখারী, ভক্ত, ভীরু থেকে বৈকুণ্ঠের ভগবান্‌কে ওঁরা সমান নিপুণতার সঙ্গে ঢেলে সাজ্তে জানেন—

চলচ্চিত্রের প্রাণ ওঁরা।

এবারও নায়ক, রাতুল বক্সী; নায়িকা, মানিনী রায়। ঐ দেখুন, আবার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। নায়ক নিরঞ্জনের ভূমিকায় যে-অভিনয় রাতুল বক্সী এবার করেছে তা'—

কি বলব! তা' অতুলনীয়, অনবদ্য, অসম্ভব—নিজেরই ১৫১ বারকে সে পদদলিত করে, এবার, এই ১৫২ বারে, একটা অপরাজয়ের মূর্ত্তিতে অভ্রলোকে উঠে গেছে, জ্যোতিষ্কের মত—ডিঙিয়ে গেছে নিজেকেই...

রাতুল বক্সীর মানুষকে পাগল করার ক্ষমতার শেষ কথা ঐটি—ঐ ডিঙিয়ে যাওয়া।

মানিনী রায়ের কথাও বল্‌তে হবে না কি! মানিনী রায় দর্শককে এবার মূর্চ্ছিত কববে—সুন্দরী শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী-কুলরানী মানিনী রায় এবার কাঁদিয়ে ছাড়বে।...বিজ্ঞাপনের কথার পুনরুক্তি করছিনে—যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই-ই তা বল্‌বে।

কিন্তু একটা কথার শেষ আমি ভেবে পাচ্ছিনে : মূর্চ্ছার পর কাঁদব না, কাঁদ্‌বার পর মূর্চ্ছা যাব, না, মূর্চ্ছা আর কান্না এক সঙ্গেই আস্‌বে!...কষ্টদায়ক এই সমস্যা নিয়ে টিকিট ঘরের কাছে যেতেই আর একবার শিউরে উঠলাম। দেখতে চলেছি।

মা এতক্ষণে তাঁর নিরামিষ তরকারী ঢালার কাঁসার বড় বাটিটা খুঁজ্‌ছেন নিশ্চয়ই; কিন্তু মায়ের নিরামিষ তরকারীর চাইতে রাতুল বক্সী আর মানিনী রায়ের আর্ট ঢের বড়, ঢের বেশী সরস। বাটির বিনিময়ে আর্টের স্বাদ যদি আমি পেতে চাই, সে কি দোষের! কাজেই সে বাটি এখন দেবনাথ নন্দীর বাসনের দোকানের গুদামে।

ফলে আধ আনার চা খেয়ে দুখিলি পান আর আড়াই পয়সার বিড়ি নিলাম—চাট্ চাই আনন্দেরই, দুঃখের চাট্ নাই।...টিকিট নিয়েছি; তারপর নীরেন, হরেন, প্রফুল্ল, নিশি, অশ্বিনী আর ভোলার সঙ্গে সারবন্দী হ'য়ে প্রবেশ করেই দেখি বেজায় জাঁক। ইন্দ্রপুরী একেই বলে...চট্ করে মনে হ'ল, রাতুল বক্সী আর মানিনী রায়ের অভিনয় দেখতে হয় এখানে বসেই, স্বর্গীয় এই হর্ম্ম্যে; আরো মনে হ'ল, জীবনটা এখানেই কাটুক—বাড়ীতে যেন যেতে না হয়।

ওদের দ্বৈতসঙ্গীতের কথা ভুলে গেছি মনে করবেন না—"পল্লবিনী" প্লেতে তা-ই শোনার পর থেকেই ত' আমি ওদের ভক্ত—

এখনও মনে হ'ল, মানিনী রায়ের
গান যেন ফুরোয় না...
বল্‌লামও তা-ই—

শুনে নীরেন, হরেন, প্রফুল্ল, নিশি, অশ্বিনী আর ভোলা একসঙ্গে বললে,—যা' বলেছিস্।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা' হ'লে কেমন হয়, ভাই ?

ওরা বল্লে, খাসা হয়।

প্রেক্ষাগৃহ ভরে' এসেছে—খুব দ্রুত ভরে' উঠছে। ভরা ঘর নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত, ভাবে কণ্টকিত, আর উদ্বেগে চঞ্চল—এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত একটা কম্পন বইছে যেন !

রুপালী পর্দ্দা ঝুলছে—বেচারা পর্দ্দা জানে না যে, কি কাণ্ডটা ঘটবে তার বুকের উপর—তাব বুকে দাঁড়িয়ে রাতুল বক্সী আমাদের মূর্চ্ছিত করে কাঁদাবে, আর মানিনী রায় দেবে রক্তে বিদ্যুৎ ভরে'...

ভাবতেই পর্দ্দার নির্জ্জীবত্বে আমার খানিক্ হাসিই পেল।

অশ্বিনীকে বল্‌লাম তা'—

অশ্বিনী বল্‌লে, খাসা বলেছিস্।

রূপোলী পর্দ্দা কাঁপছে—দর্শকেরা ঘন ঘন হাত-ঘড়ি দেখেছে ; ভোলা বল্‌লে, আর পাঁচ মিনিট।

কিন্তু পাঁচ মিনিটই যে পাঁচ যুগ !

প্রেক্ষাগৃহ শান্ত হ'য়ে এসেছে—

আমাদের বুক কাঁপছে—অসহ্য চমৎকার ধারণাতীত কি যেন একটা অকস্মাৎ আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—চোখে মুখে প্রাণে বুকে ঝলক্ লেগে আমরা যেন বোকা বনে' যাব।...কিন্তু আপনারা কি কোনোদিন টের পেয়েছেন, ১৫২ বারের প্রতিভার কাছে বোকা বনতে কত আনন্দ।

পর্দ্দার উপর থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডের গান আসছিল—তা' বন্ধ হ'য়ে চট্ করে' আলো নিবে যেয়েই পর্দ্দার উপর দেখা দিল "সীবনালয়—যাবতীয় পোষাক পরিচ্ছদ সুলভে বিক্রয় হয়"—

মুখ দিয়ে গা'ল বেরিয়ে গেল—

বললাম, সুরু হ'ল বিজ্ঞাপন। কি যে করে বেটারা!

প্রফুল্ল বল্‌লে, মাইরি।

কি যে আক্কেল! শত শত লোক হা প্রত্যাশায় বসে' আছে কি জুতো জামা লেপ তোষক ওষুদ গয়নার বিজ্ঞাপন পাঠ করে' উপকৃত হ'তে! রাতুল বক্সী আর মানিনী রায়কে দেখাবার আগে দেখান হল কিনা ঘি ময়দার দোকান! চড়িয়ে দিতে হয়। অমূল্য রস পরিবেশনের সূত্রপাতের মধ্যে নারকীয় নির্বোধের মত ব্যবসার এ:শেষ করা হ'লে পর্দা আবার অন্ধকার হল ...

নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এল— মনে হ'ল তুফান উঠছে। ঘর এ:কবারে নিঃশব্দ; মানুষগুলো যেন জেগে' নেই—আর "সিনেমা" দেখ্‌তে তারা "হলে" ঢোকে নাই ঢুকেছে যেন কবরে।

আমরা অন্ধকারে নিঃশব্দ—

পর্দ্দার উপর আলোর বন্যা এসে পড়ল—অসংখ্য নাম এবং শিল্প সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় বোঁ বোঁ শব্দে এল আর বেরিয়ে গেল—সে সবই আমাদের কণ্ঠস্থ, পড়ার দরকার হ'ল না।

তারপরই এল আসল বস্তু—

দৃশ্য কক্ষ। অমন করে সাজান কক্ষ কল্পনা করতে কে পারে! কিন্তু এরা তা-ই করেছে—কল্পনাকে মূর্ত্তিই দিয়েছে...

প্রবেশ করল' নিরঞ্জন, নায়ক—

রাতুল বক্সী নায়ক সেজেছে বলে' তার মূর্ত্তিকে সম্বর্দ্ধনা করে একটা ক্ল্যাপ পড়ল। এমন করে' প্রবেশ করতে আর কাউকে দেখিনি। পূর্বেকার ১৫: বারের একবারও রাতুল বক্সী এমন করে' প্রবেশ করেনি। নিখুঁৎ আর্ট দেখে অবাক্ হ'তে হ'ল। প্রবেশ করল একাই—কেউ তার সঙ্গে নাই। কাউকে সঙ্গে না নিয়ে প্রবেশ করাও এই তার প্রথম —অভিনবত্বে ভারি মুগ্ধ হ'লাম।

রাতুল বক্সীর পায়ের ধূলো নিতে হয়—পাদচারণা করছে দেখুন।

কেবল হাঁটার ভঙ্গীতেই কঠিন উদ্বেগের সঞ্চার করতে পারে কেবল রাতুল বক্সীই।

নিরঞ্জনের ভুমিকাভিনেতা রাতুল বক্সী ঘরের ভিতরকার আসবাবগুলি ঠেলে' ঠেলে' দিয়ে আর মাথা ঝুলিয়ে, অর্থাৎ অত্যন্ত চিন্তামগ্ন অবস্থায় খানিক্ পাদচারণা করার পর টেবিলের সাম্‌নে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল'—থম্‌কে দাঁড়াল তবু গা নড়ল না! কেউ আজ পর্য্যন্ত ভাবতে পেরেছে যে, মানুষ থম্‌কে দাঁড়ায় অথচ গা নড়ে না। রাতুল বক্সীর সবই অলৌকিক—

তারপর চোখের চশমা চোখ থেকে খুলে ফেলল খুব অসহিষ্ণুভাবে—খুলে রেখে দিল টেবিলের উপর ডাঁট মুড়ে' আর কাচ উপর দিকে তুলে।

ভাবুন একবার, খালি রেখে দিল—টান মেরে' ফেলে দিল না। কিন্তু আমার মনে হ'ল, টান মেরে ফেলে দিলেই যেন স্বস্তি পেতাম, এমনি তার চশমা রাখার সংযত ভঙ্গী। সংযমের দ্বারা বেগের সৃষ্টি কর্‌তে পারে একমাত্র ঐ রাতুল বক্সী। ঠিক্ অমন করে' টেবিলের ঠিক্ মাঝখানে উত্তর ও দক্ষিণ কোণ লক্ষ্য করে' চশমা সে ১৫১ বারও রাখে নাই—এবার রাখল।

মনে হল ঘটনা সাংঘাতিক।

প্রাণপণে তাকিয়ে আছি—

হঠাৎ পকেট থেকে একখানা খাম বা'র ক'রে একটানে তার পাশ থেকে খানিক্ ছিঁড়ে ফেলে টেনে বা'র কর্‌লে চিঠি; এক নিমেষের এক চতুর্থাংশ কাল চিঠির দিকে তাকিয়েই চিঠি সে ছুড়ে ফেলে দিল হাতের একটা ঝাঁকি মেরে……

ভাবতে কেমন লাগে না কি, দরকারী কাগজ খানা সে অবজ্ঞাভরে ছুড়ে ফেলে দিল!………কিন্তু তার কারণটা সে তখনই বল্‌লে; বললে, আস্‌ছে এখানেই, শিপ্রার হাতে তাকে সমর্পণ করতে।

ভাবলাম, তাকে, কাকে?

দেখুন কি অদ্ভুত ব্যাপার। কে একজন আসছে—কিন্তু কেবল নিজে আসছে না; তৃতীয় কাউকে শিপ্রার হাতে সমর্পণ করতে আসছে।

দর্শককে ঝুলিয়ে রাখাই হচ্ছে আর্ট, স্বীকার করুন বা না করুন।

নিরঞ্জনের হাত ধীরে ধীরে চিবুকে উঠ্‌ল...খুব দুর্ভাবনার কথা না হ'লে রাতুল বক্সী হামেসাই চিবুকে হাত দেয় না—

ভাবিয়ে তুল্‌লে।

আবহ সঙ্গীত চল্‌ছে—

তার উপর উঠ্‌ল অনিন্দ্য সুরেলা কণ্ঠের প্রভাতের প্রথম আলোর মত গান একটি। নিশ্চয় কাব্য-সঙ্গীত—ধ্বনিটাই পেলাম, প্রথমটা কথা বুঝা গেল না...গান এগিয়ে আস্‌ছে...শুন্‌লাম "প্রাণের মূলে প্রাণ এসেছে, গানের সুরে প্রাণ ভেসেছে"......

নিরঞ্জন তখন চেয়ারে বসেছেন।

বস্‌বার স্থানে স্প্রিং ছিল কি রবার ছিল কে জানে, বসতেই নিরঞ্জনের দেহ দুবার নেচে উঠ্‌ল, আর অগ্রসরায়মান গানের সঙ্গে দেহের দোলনের এমন একটা আর্টিষ্টিক তালসঙ্গতি ঘটে গেল, যা কেবল বিশ্বতোষ ফিল্ম কোম্পানী লিঃ-র অবদানেই সম্ভব।

তা'-ই বলো, নইলে অমন গান কে গাইতে পারে! কিন্নরীনিন্দিত কণ্ঠে অমন সুরের ফেনা কে ভাসিয়েছে এ-র আগে।

গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করল, দেখেই চিনলাম, মানিনী রায়—শিপ্রার ভূমিকায় মানিনী রায়।

কিন্তু নিরঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শিপ্রা গানের ফোয়ারা প্রবেশ করে নাই, এ ত বালকেও বোঝে—শিপ্রা গান গায় প্রাণের প্রাবল্যে,যৌবনের উদ্দামতা আর সুখস্বপ্ন বিচ্ছুরিত করতে......

কাজেই, আর্ট রাতুল বক্সীর সহজাত বলেই নিরঞ্জনসাজা রাতুল বক্সী জাজ্বল্যমানা শিপ্রার দিকে একবার চেয়েও দেখ্‌ল না।

শিপ্রা যখন অমৃত কণ্ঠে প্রশ্ন ঝঙ্কৃত করল, "তুমি এসেছ?"—

তখন নিরঞ্জন চোখ তুলতে লাগল এত ধীরে ধীরে যে, মনে হল, উত্তোলন বুঝি শেষ হবে না।

কিন্তু শেষ হল এবং তার ফলে চারি চক্ষুর মিলন হ'ল; নিরঞ্জন বল্‌ল,—এসেছি শিপ্রা; কিন্তু যে আমাকে তুমি চিনতে ভালবাসতে, সে আমি নই।

বুঝতে দেরী হ'ল না, প্রব্লেম দেখা দিচ্ছে; একটি কথায়, অর্দ্ধেক ইঙ্গিতে প্রব্লেম ঘনিয়ে তোলা যার-তার কর্ম্ম নয়।

—সে কি কথা বলছ তুমি? কি হয়েছে তোমার?

শিপ্রা শিউরে উঠল—শিহরণ, আমরা দেখতে পেয়ে একটা শৈত্য অনুভব করলাম।

—মহেশ কোথায়?

—একটু বেরিয়েছে।

মহেশ কে বলুন দেখি! পারবেন না।

—অদৃষ্টই মন্দ আমার। এই সময়ে সে-ও অনুপস্থিত।

মহেশ কে জানেন! ভৃত্য। অত্যন্ত হৃদয়বান্ আর ইঙ্গিতজ্ঞ ভৃত্য পালায় সন্নিবেশিত হয়েছে—

প্রতাপ গুপ্ত না কি উৎরেছে চমৎকার।

মহেশের অনুপস্থিতির দরুণ আমাদের প্রিয়তম নট রাতুল বক্সী যে অসুবিধা বোধ ক'রল, তাতে আমাদেরও কষ্ট হ'ল...আবার এ-কথাও মনে হ'ল, পরিস্থিতির ঘনতা ঘটবে এই সূত্রেই।

"শিপ্রা আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে?" নিরঞ্জন জানতে চাইলে কম্পিত কণ্ঠে।

শিপ্রার চোখে জল এল—

তোমার অপরাধ কি তা' ত আমি জানিনে?

অপরাধ না জানার দুঃখও যে ভয়ঙ্কর তা' আমাদের স্বীকার করতে হ'ল। চোখের জল আর করুণ কণ্ঠ একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর আর হৃদয়গ্রাহী করতে মানিনী রায়ই জানেন।

নিরঞ্জনের গলার ইমোশনের কম্পন এখনো থামে নাই—কম্পিত কণ্ঠে সে পুনরায় বল্‌লে, "অপরাধ আমি করেছি। নিভৃতে তা' করেছি —আয়োজন করে' করেছি। ...একটা কথার সত্যি জবাব দেবে, শিপ্রা?"

—জিজ্ঞাসা করো!

স্পষ্টভাষা ঠিক এমনিভাবেই উচ্চারণ করতে হয়।

—একটি পুরুষ কি দুটি নারীকে একই সঙ্গে একই রকম ভালবাসতে পারে না!

আমার হঠাৎ মনে হ'ল, গ্রামোফোন রেকর্ডের দু'পিঠেরই গান যদি ভাল লাগে, তবে তাতে যেমন দোষ নেই, এতেও তা' নেই।

শিপ্রাকে ঐ জন্যই ভাল লাগ্‌ল'—পারা না পারার প্রশ্নের পর উচিত কি অনুচিত তা' সে জান্‌তে চাইলে না; অম্লানবদনে বল্‌লে, পারে।

নিরঞ্জন তীরবেগে উঠে' দাঁড়াল'—

বল্‌ল, মহীয়সী তুমি; তা'-ই তুমি বল্‌ছ, পারে; কিন্তু ক্ষুদ্রচেতা নারী তা' বল্‌তে পার্‌ত' না...তুমি আমার নমস্যা; তোমাকে আমি নমস্কার করি।

ঔদার্য্যের সম্মুখে, নিরঞ্জন চোখ বড় ক'রে স্তম্ভিত হয়ে রইল...

একটা অতিশয় দুরূহ ঘটনার আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে। দেখুন, কি কৌশলে ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হ'চ্ছে। ...একজন কে আসছে' আর একজনকে নিয়ে—

নিরঞ্জন ঐ কথা বলে' তারপরই বল্‌ল, অপরাধ আর তা' ক্ষমা করার কথা...তারপর বল্‌লে দু'টি নারীর সঙ্গে একই প্রণয়ীর প্রণয়ের কথা...তারপরই গদগদ কণ্ঠে বল্‌লে, তুমি মহীয়সী।...এই অগ্রগত যুগে, অগ্রগত ইঙ্গিতজ্ঞ দর্শককে নাচিয়ে তুল্‌তে আর কিছু বলার দরকার আছে কি! ...আমার ত উৎকণ্ঠায় বুকের রক্ত জোরে জোরে চল্‌তে লাগল...

আস্‌ছে যে, সে কে? ভেবে' ভয়ঙ্কর ঝুলে থাক্‌লাম...

নমস্কারের কথায় শিপ্রা উঠ্‌ল' খিল্‌ খিল্‌ করে' হেসে। এই হাসিই মানিনী রায়কে অমর করবে, আমার তা-তে সন্দেহ নেই। হেসেছিল একদিন ভুবনমোহিনী গ্রেটা গার্ব্বো, আর হেসেছে বাংলার মানিনী রায়।

তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হ'য়ে শিপ্রা বল্‌লে, সতী রমণী নমস্যা বটে, সন্দেহ নাই। আজকালকার যুগে সতী রমণী হয়েছে উপহাসের পাত্রী। তোমার মুখে নমস্কারের কথা শুনে' তুষ্ট হ'লাম—তোমার নমস্কার গ্রহণ করলাম। কিন্তু কথাটা কি বলো দেখি শুনি?

পৃথিবী কতদূরে এগিয়েছে দেখুন। স্ত্রী স্বামীর নমস্কার অম্লান বদনে, আর যেন অতিশয় সভ্য ধন্যবাদের সহিত, গ্রহণ করছে। আগের দিনে এ কথায় স্ত্রী দাঁতে জিব্‌ কেটে' চেঁচিয়ে উঠ্‌ত; বল্‌ত', ছি, ছি; পাপ হ'ল যে আমার! বলে' শশব্যস্তে গলায় আঁচল জড়িয়ে স্বামীর পায়ের ধূলো নিত; কিন্তু সে-দিন বর্ত্তমানের বাইরে পড়ে গেছে।

"সতী হয়েচে উপহাসের পাত্রী।—"সবিস্ময় এই উক্তির উক্তিটা বাদ দিয়ে বিস্ময়টা অত্যন্ত একেলে···অথচ সতী বলে শিপ্রার দর্পটাও দেখুন।

মনে হ'ল, 'অথরকে' ডেকে' পাঠাই।

নিরঞ্জন বল্‌তে লাগল, আমি ত' তোমাকে একদিনও কম ভালবাসিনি, অনাদর করিনি, শিপ্রা! কর্ত্তব্য করিনি' আমি?

এই চমকপ্রদ সংযত উচ্ছ্বাস রাতুল বক্সীর একান্ত নিজস্ব!

প্রশ্ন শুনে' শিপ্রার হয়তো চক্ষুলজ্জা হ'ল—অন্য দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল, করেছ।

স্বামী কর্ত্তব্য করেছে তা' স্বীকার কর্‌তে অম্‌নি কাঁদ'-কাঁদ' গলাই স্বাভাবিক।

—তবে?

নিরঞ্জন গাঢ়কণ্ঠে জান্‌তে চাইলে।

আমরাও বুঝতে পারলাম, এখানে প্রশ্নের সুরে আর গাঢ়কণ্ঠে 'তবে'

শব্দ উচ্চারণ করার নিগূঢ় অর্থ আছে—নিরঞ্জনের মনে একটা নিদারুণ অব্যক্ত দ্বন্দ্ব চল্‌ছে।

শিপ্রা চমকে উঠে বল্‌লে, তবে মানে কি?

—মানে কিছু নেই, শিপ্র, একটা মানে ছাড়া। শোন তবেঃ তোমাকে আমি ভালবেসেছি আত্মাকে ঢেলে দিয়ে; কিন্তু আর একজনকে ভালবেসেছি আত্মাকে সসম্ভ্রমে দূরে রেখে কেবল দেহ দিয়ে; আত্মায় আমার পাপের স্পর্শ ঘটে নাই—সেখানে আমি অম্লান।

ইন্‌টেনসিটিটা দেখুন একবার; আর বলুন দেখি, এর উত্তর কি হ'তে পারে! আরো বলুন দেখি, শিপ্রা লাফিয়ে উঠবে, না, গড়িয়ে পড়বে?

তা' কিছুই সে করল' না—এমন নিস্পৃহ হয়ে থাক্‌তে পারে নাট্যকারের অতুলনীয় সৃষ্টি শিপ্রা ছাড়া আর কেউ?...স্বামী স্ত্রীকে আত্মায় আবদ্ধ রেখে' অন্য রমণীকে নির্জলা দৈহিকভাবে ভালবেসেছে, এ-কথা শুনে চমকাবার আর্ট পুরনো হ'য়ে পচে' গেছে; শিপ্রা আত্মপক্ষে পুরুষ সম্বন্ধে ঐ কথা বল্‌লেও উদ্দাম কিছু ঘটত' না। ঘটনার স্বাভাবিক গতির পথে আজকাল কেউ বাধা দেয় না।

শিপ্রা বল্‌লে, তুমি কি করেছ না করেছ তা' আমি গণ্য মনে করিনে। কিন্তু তোমার এই অকপটতার জন্য তোমাকে আমি অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাকে তুমি বিশ্বাস করো—তোমার এ মহানুভবতা আর চরিত্রের শক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছে। ...সে কে?

—বল্‌ছি।

মনে হ'ল নিরঞ্জনের কণ্ঠ শুষ্ক। নরম মমতার সহিত শিপ্রা বললে, চা আনতে বলব' এক কাপ?

—না।

ধ্বনি শুনে' চমকে উঠলাম; ধমক্ নয়, আতঙ্ক নয়, অভিসম্পাৎ নয়, প্রত্যাখ্যান নয় শোক—চা-পান করতে এখন সে অক্ষম, তারই শোক...

আমাদের মনে হল, রাতুল বক্তার ঐ অপরিসীম ভাবসংযুক্ত "না"

শব্দটি একখানি একাক্ষরা কাব্য ; কেবল কাব্য নয়, সুগঠিত ; অর্থৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ, ব্যঞ্জনায় আর অভিব্যক্তিতে অনবদ্য একখানি কাব্য—কত যে তার শক্তি, ভাবার্থ গূঢ়ার্থ আর স্পষ্টতা, তা' বলবার নয়। স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ্ গেল—

চুপ করে' থাক্‌তেও জানে ঐ রাতুল বক্সী—সকলের চাইতে ভাল জানে—চুপ করে' থাকার বেশ দিশে আছে। ...কিন্তু তোলপাড় হ'তে লাগ্‌লাম আমরা—নিঃশব্দতার গভীর অভ্যন্তর থেকে প্রবাহিত হ'য়ে একটা ঘূর্ণায়মান ভাষার ঢেউ এসে লাগ্‌ল আমাদের বুকে...

ঐ পরম নিঃশব্দতা ভঙ্গ হল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ জেগে—

তা' তা' হ'লই ; কিন্তু তখন যদি রাতুল বক্সীর ঠোঁটের মুচড়ানি আর চোখের কাৎরানি, অর্থাৎ যন্ত্রণা আপনারা দেখতেন, তবে কি করতেন জানিনে।

সিঁড়ির ঐ পায়ের শব্দের সঙ্গে এই নাটকের মূল সংলগ্ন আছে, তা' অনুভব করলাম...বুক দুরুদুরু করতে লাগল...গুরুতর পরিস্থিতি আসন্ন শিপ্রা আর নিরঞ্জন একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উন্মুক্ত দরজার দিকে...

এসে দাঁড়াল' সুভদ্রা, কোলে একটি কচি শিশু ; মাথাটা ছাড়া তার সমগ্র দেহ বস্ত্রাবৃত...সুভদ্রার চোখে অনন্ত কাতরতা আর অনন্ত কুণ্ঠা ...সাম্‌নের চুল যতটা দেখা গেল তা' অবিন্যস্ত—

অপরাধিনী অথচ করুণাপ্রার্থিনীর ভূমিকায় মানসী দেবীর জুড়ি নেই।

কিন্তু সব চাইতে অবাক্ করলে শিপ্রা ; সে দৌড়ে গিয়ে সুভদ্রার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিল ; বিগলিত কণ্ঠে বলল—এস, দিদি, আশীর্ব্বাদ করো তোমার এই ছোট বোন্‌টিকে।

প্রেক্ষাগৃহে ধন্য ধন্য রব উঠল...

সুভদ্রা বললে,—আশীর্ব্বাদ করলাম, বোন্ ; কি বলে' আশীর্ব্বাদ

করলাম,তা, বলব' না ; কিন্তু আমি ঠিক্ জানি, ভগবানের কানে তা পৌঁছেচে।

ভগবান্ অধুনা কেবল হৃদয়ের প্রাঞ্জলতা দেখেন, এটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

নিরঞ্জন তখন মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে তাকিয়ে আছে··· তার তখনকার মুখের চেহারা সত্যই হৃদয় বিদারক। দুইটি নারীর শুভ মিলনের মধ্যে তার এই স্নায়বিক ভগ্নাবস্থা কি যে কৌশলময় আপনারা তা. কি বুঝবেন।

সুভদ্রা একটু থেমে' বলল' তোমার জিনিষ তোমাকেই দিতে এসেছি, বোন। এ-কে ত' তুমি ফেলতে পারবে না। নাও।—বলে' কোলের কচি শিশুটিকে এগিয়ে ধরল' —

শিপ্রা তাকে টেনে নিল—বুকে চেপে ধরল প্রাণপণে—চুম্বনে চুম্বনে তাকে ডুবিয়ে দিল।

বলল,—নিলাম ; কিন্তু তোমাকে ত, আমি ছাড়ব না, দিদি। এই শান্ত প্রেমকুঞ্জের অভ্যন্তরে আমরা দুজনে থাকব, একই শাখাসংলগ্ন দুটি ফুলের মত—একই হৃদয়সূর্য্যের আলোকে আমরা সানন্দে নিঃশ্বাস ফেলে ফুটে থাকব—একই হৃদয়ের প্রেমের দুটি ধারায়, গঙ্গা যমুনায় নিত্য অবগাহন করে আমরা ধন্য হব।

বল্‌তে বল্‌তে নিরঞ্জনেব প্রেমের কৃতজ্ঞতায় শিপ্রা গদগদ হ'য়ে উঠল, আর প্রত্যাশী অনিমিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুভদ্রার চোখের দিকে···

সুভদ্রা বল্‌ল,—তা' হয় না, বোন্। কেন হয় না ওঁকে তা' জিজ্ঞাসা করো—ওঁর মত বুঝিয়ে বল্‌তে কেউ পারবে না, এ আমি জোর করে বল্‌ছি।···যদি ত্যাগই না করি, তবে তোমাদের পাব কি করে।···ভালবাসা কেবল কাছেই টানে না, ঠেলে দূরেও দেয়।

বল্‌তে বল্‌তে সুভদ্রার মুখ প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল'···

"সুভদ্রা" বলে' একবার ভগ্নকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে' নিরঞ্জন কুশনের উপর চিৎ হ'য়ে এলিয়ে পড়ল···

দেখে আমার বুকের ভিতরটা কেমন করতে লাগল তা' প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই।

শিপ্রা এগিয়ে এসে নিরঞ্জনের মাথায় হাত রাখল; স্নেহে তাকে সিঞ্চিত করে' বল্‌ল,—ভেব না তুমি। যেখানেই যাক্ আবার ফিরে আসবে আমি শপথ করে বলচি। তোমাকে যে পেয়েছে সে তোমাকে ভুলে কাছছাড়া হয়ে বেশীদিন থাক্‌তে পারবে না; আমারই মন দিয়ে তা আমি জানি...আমার অন্তর্য্যামী আমাকে বলছেন সুভদ্রা আবার আস্‌বে।

একটা প্রচণ্ড ক্ল্যাপ পড়ল—সেই শব্দের দরুণ বিঘ্ন ঘটে খানিকটা কথা শোনা গেল না; কিন্তু আমার মনে হতে লাগল প্রেমের আকর্ষণে ফিরে আসার বিশ্বাসের কথা অপর কোথাও যেন পড়েছি।

ক্ল্যাপ থাম্‌লে শুনলাম শিপ্রা বলছে, ছিঃ কেঁদ না, অনুমতি দাও, যাক।

সুভদ্রা এসে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করল নিরঞ্জনকে; নিরঞ্জনের তখন চোখ দিয়ে অজস্র জল গড়াচ্ছে—শিপ্রার চোখে অনন্ত জল—সুভদ্রার চোখেও তা ই।

আঁচলে চোখ মুছে শিপ্রা বললে তোমার কোনো পরিচয়ই জানিনে, দিদি; কিন্তু অন্তরের যে পরিচয় আজ পেলাম, সে-ই তোমার শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। তুমি সাধ্বী-শিরোমণি। ...একটু থেমেই বলল—আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, দিদি—তোমাকে আজ ছেড়ে দিলাম তোমারই মুখ চেয়ে; কিন্তু মাথার দিব্যি দেয়া রইল, এস আবার—আমরা তোমার প্রতীক্ষা করব।

—আসব। কিন্তু আজ যাই। বলে ক্লোজ আপ-এ নিরঞ্জনের দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল—

সবাইকার আঝোরে কান্নার মধ্যে সে দৃশ্যের শেষ হল।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা গেল রেলওয়ে ষ্টেশন—গাড়ীতে যাবে বলে যাত্রীরা এসেছে—যাত্রীতে প্লাটফর্ম্ম বোঝাই—খুব অস্পষ্ট দেখা গেল,

প্লাটফর্ম্মের একপাশে ভিড়ের বাইরে ষ্টীল ট্রাঙ্কের উপর একটি মেয়ে বসে আছে…হঠাৎ ক্লোজআপ-এ খুব পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিল একখানা মুখ —মুখখানা সুভদ্রার—ভারি বিষণ্ণ; পেটের সন্তান আর প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করে অজানা দূরে স্বেচ্ছায় চলে যেতে হলে নারীর মুখ যতটা বিষণ্ণ হতে পারে ঠিক ততটাই বিষণ্ণ—তার একতিল কম নয়, একতিল বেশী নয়।

এমন মাত্রাজ্ঞান এর আগে দেখেছি ব'লে মনে হল না।

ক্লোজ-আপ্-এর ভেতর সুভদ্রা বল্লে: "হে সুদূর, আমি আশ্রয়-প্রার্থিনী। স্বামীর প্রেমহীন কঠোরতার দিনে তোমাকেই আমি অহর্নিশি অবিরাম স্মরণ করেছি গৃহকোণে বন্দিনী হ'য়ে—আমার সেই স্মরণে যদি কোথাও রেখা প'ড়ে থাকে তবে দেখবে তা' সমুদ্রের তরঙ্গের মত অন্তহীন। …আজ আবার এই উন্মুক্ত সীমাহীন পৃথিবীর বুকে একা, একেবারে একা, দাঁড়িয়ে স্মরণ করছি তোমাকেই। স্থান দাও, স্থান দাও…

নিরাকারকে সম্বোধন ক'রে ঐ কাকুতি ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল—তার সঙ্গে আবহ সঙ্গীতের বেহালার সুর ভারি করুণ সুরে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল…

কিন্তু সবাই জানে, সঙ্গীতে যেমন বেদনা মূর্ত্ত আর অশ্রু সজলতো নিবিড় হ'য়ে উঠে, শুধু কথায় তা' হয় না—

সুভদ্রা প্লাটফর্ম্মের উপর ষ্টীল ট্রাঙ্কে বসেই বেহালা আর বাঁশীর সঙ্গে গান গাইলে একটি—

"সুদূরের পথিক আমি"—ইত্যাদি। "সুদূরের পথিক" শব্দ দুটির ভিতর বেশ কাব্যরস আছে; কিন্তু সেখানে ভিড় জম্‌ল না এবং গান শেষ হতেই ট্রেণ এসে গেল।

…দৃশ্য নিবেই আবার ফুটে উঠলো পর্দ্দার গায়ে—গাড়ীর কামরার ভিতর ব'সে আছে সুভদ্রা—ক্লোজ-আপ্-এ আমরা তাকে বিশেষ ক'রে দেখ্‌লাম। মেয়েতে গাড়ী ভর্‌তি—সুভদ্রার পাশেই একটি মেয়ে বেশ

স্বচ্ছন্দে ব'সে·আছে। ···আমার সাম্‌নের সীটের লোকটি কাশ্‌তে সুরু করায় খানিক কিছুই শোনা গেল না, তবে ঠোঁট নড়ায় বুঝা গেল, সুভদ্রার সঙ্গে মেয়েটি কি যেন আলাপ করছে···

কাশি থাম্‌লে শুন্‌লাম, সুভদ্রা হেসে হেসে বল্‌ছেঃ স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছ বুঝি, ভাই ?

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে কে আছে ?

—কে আবার থাক্‌বে! কেউ নেই।

—একা চলেছ! মাগো; তোমার সাহস ত' খুব!

—কিন্তু ভয় কিসের ?

—ভয় নেই! পুরুষগুলো কি কম বজ্জাত!

—বজ্জাত পুরুষের হাতে পড়েছ কোনদিন ?

—না, বালাই। তবু জানি ত'! কাগজে পড়েছি ঢের।

—সে তুমি পড়েছ দু' একটি ; ভাল মানুষও ত' ঢের আছে।—তোমার স্বামী যেমন।

—তা' সত্যি।

—আবার বজ্জাত্ পুরুষ তেমন মেয়ের পাল্লায় পড়লে জব্দও হয় খুব।—ব'লে সুভদ্রা হাসতে লাগল···

—জব্দ করেছ কখনো ?

—না ; সুযোগ হয়নি ; কিন্তু বড় ইচ্ছে করে যে জব্দ করি।

—কেন ?

—জীবনের বৈচিত্র উপভোগ করতে। মেয়ে মানুষের জীবনটা কি চরম একঘেয়ে নয়! রাঁধো বাড়ো খাও দাও আর স্বামী সেবা করো। সেই একঘেয়েমি সহ্য করতে না পেরেই ত' বেরিয়ে পড়েছি।

—কোথায় যাবে ?

—কোথায় যাব জানলে ত যাওয়ার শেষ তখনই হ'য়ে গেল। কোথাও যাব না, অথচ যাব এমন স্থানে যেখানে একটা দিকের শেষ আর একটা দিকের সুরু হবে।

মেয়েটি বল্‌লে,—কি জানি।…স্বামীকে ছেড়ে তুমি এই কাজে বেরিয়েছ!

—এক কাজ ত' সবারই নয়, ভাই! আমাকে তোমার পাগল মনে হচ্ছে, না?

—পথে পথে কেন বেড়াবে ভদ্দর ঘরের মেয়ে হয়ে! আমাদের বাড়ী চলো; আমি একা থাকি।

শুনেই হয়তো কারো কারো মনে হ'ল, মেয়েটির নাম দানবী, আর গৃহদাহের নকল করেছে এই চলচ্চিত্র রচয়িতা…

কিন্তু তা' নয়—নাট্যকার বারাণসী দস্তিদারকে আমরা জানি।

সুভদ্রা বল্‌লে, আর একটা দিক্ সুরু করিয়ে দেবে?

—তা' আমি জানিনে। ভাল বুঝতেই পারছিনে তোমার কথা!

—পারবে বৈ কি, চেষ্টা করলেই পারবে। তোমার নামটি কি, ভাই?

—পদ্মা।

—তোমার?

—সুভদ্রা।

—নাম তোমার পদ্মা, কিন্তু কূল ভাঙার কথা তুমি বোঝো না?

পদ্মা একটু হেসে চোখ নামাল—

এবং তার আনত মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুভদ্রার চোখে এমন একটা দৃষ্টি ফুটে উঠ্‌ল যাকে হিংস্র বলা যেতে পারে…

সুভদ্রার চরিত্রের রকম সকমে আমরা ঘুণাক্ষরেও ধরতে পারিনি যে তার দৃষ্টি হিংস্র হ'তে পারে—হ'ল দেখে অবাক্ হলাম—পরবর্ত্তী ঘটনার ইঙ্গিত আর সুভদ্রার চরিত্রের জটিলতা যুগপৎ উদ্‌ঘাটিত হ'ল একটি চাউনিতে!

দৃশ্যটা কেটে দেখান হ'ল গাড়ীর গতির দৃশ্য…

গাড়ী ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল—

পদ্মার স্বামী; স্বাস্থ্যবান সুদর্শন সুবেশধারী যুবক, এসে বল্‌ল,—পানটান চাই নাকি তোমার?

পদ্মা বল্‌লে, না।

—এঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল?

—হ'ল।

অকস্মাৎ ক্লোজ আপ্-এ দেখা গেল, সুভদ্রা যুবকটির দিকে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে আছে—যুবকটির ক্লোজ আপ্-এও দেখা গেল, সে সুভদ্রার দিকে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে আছে।

এই তাকাতাকির সুযোগ কেমন করে ওরা পেলে তা অবশ্য দেখান হল না—হলেই খারাপ হত; অতিরিক্ত ডিটেলস্ যে টেম্পোকে ব্যাহত করে নিশ্চয়ই তা জানেন।

—চল্লাম। বলে যুবকটি চলে এল।

চলচ্চিত্রের আর্ট যাঁরা বুঝেন তাঁরা অবশ্যই সন্দেহ করছেন, এ হতে পারে না—একটা দৃশ্য অতবড় হতে কিছুতেই পারে না।

তাঁদের ধন্যবাদ; কিন্তু সেই সঙ্গেই শিল্পীদেরও ধন্যবাদ...

ইত্যবসরে মাঝে মাঝে সুপারইম্পোজে আর চমৎকার ফলপ্রদ ভাবে, শিপ্রাকে, নিরঞ্জনকে আর সুভদ্রার মেয়েটিকে দেখান হয়েছে—মেয়েটিকে শিপ্রা কত যত্নে লালন করেছে তা ও আমরা দেখেছি।

শিপ্রা মেয়েটিকে বলছেঃ আমার স্বামীর দান রে তুই—কোথা থেকে তুই এসেছিস্ তা বিচার করবার অধিকার আমার নেই।...সমগ্র সুন্দর সজীব পৃথিবীর অংশ তুই, ভগবৎ সত্তার ক্ষুদ্র একটুখানি বিকাশ, সৃষ্টি শৃঙ্খলার একটি গ্রন্থি—অনশ্বর আত্মার তুই মর্য্যাদা। কিন্তু এত কথা তোর জন্মদাতা বোঝে না—সে হেঁট হয়ে আছে। হায় নির্বোধ পুরুষ!

নাটকের মাতৃধারায় ফিরে আসুন—ঘটনা এগিয়ে চল্‌ছে...

এমন অমোঘ ইঙ্গিত কল্পনা করতে পারে কেউ? সেই ইঙ্গিতে ঘটনার বিপর্য্যয় ঘটিয়ে দিল...

ট্রেণ দাঁড়াল—যুবকটি ছুটে এসে মেয়ে-কামরার দরজায় দাঁড়াল, বললে, নামো।

পদ্মা ব্যস্ত হয়ে উঠল—নেমে পড়ল, এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়ল সুভদ্রা। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সুভদ্রা বলল,—নূতন দিকের সন্ধান পেয়েছি, বহিন্…আমি তোমার কাছেই যাব দুদিনের অতিথি হয়ে; স্থান দেবে?

"বহিন্" সম্বোধনের সুমিষ্টতা লক্ষ্য করলাম।

পদ্মা বল্‌লে, এস, দিদি। আমার আজকের যাত্রা সার্থক হল তোমাকে পেয়ে। তোমাকে আমি চিনেছি। অকারণে তুমি গৃহ ছেড়ে আস নাই। তোমার মত স্বাধীন বড় মন যার তাকে বন্দী করে' রাখ্‌তে পারে এমন বন্ধন ত' সংসারে দেখিনে।—বলে' পদ্মা সুভদ্রার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিল।

কিছু আগেই পদ্মা বলেছিল, সে বোঝেনা কিছুই। কিন্তু এখন তার ভাবদ্যোতক উচ্চাঙ্গের কথা শুনে' মুগ্ধ হয়ে গেলাম—আকস্মিক বিকাশ বলে' একটা ফলাফল অবশ্যই আছে—তা' ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে আর্ট…

আমার পাশ থেকে অশ্বিনী চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, বহুৎ খুব।

আমার মনেও ঐ ধ্বনিটা উঠেছিল—

অশ্বিনী চেঁচিয়ে উঠতেই আমি তাকে অন্ধকারেই জড়িয়ে ধরলাম। কেন যে ধরলাম তা' কে বুঝবে! আনন্দ ধারণের ক্ষমতা হঠাৎ হারিয়ে গেলে মানুষ দিশেহারা হবেই।

দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হ'ল।

বিশ্বনাথের বাড়ী—পদ্মা, বিশ্বনাথের স্ত্রী, পা মেলে বারান্দায় বসে আছে—সুভদ্রা পিছনে বসে' তার চুল বেঁধে দিচ্ছে।

তারই ঠিক্ কোণের জানালার খড়্‌খড়ি খুলে,—বিগ্‌ ক্লোজ-আপ্‌-এ দেখা গেল দু'টি'চোখ…

কার চোখ ঐ চোখ দুটি, পৃথিবীর কেউ তা' জানে না। আমরা অবাক্ হ'য়ে গেলাম ঘটনার কৌশলময় বিন্যাসে—এই দেখে যে পদ্মা

আর সুভদ্রা বিন্দুমাত্র টের পাচ্ছে না, দুটো বৃহৎ নিষ্পলক চক্ষু ওদিকে রয়েছে...

একটা গান গাও না, দিদি। তোমার মত মিষ্টি গলা আমি শুনিনি।—মিনতির সুরে পদ্মা বল্‌লে।

—গানের কত গলা শুনেছিস্ আজ পর্য্যন্ত ?

—থিয়েটারে ত' শুনেছি !

—তার চাইতেও আমি ভাল ?

—হুঁ।

এমন করে' পদ্মা সুর টানল' যে আমাদেরও তা-তে সন্দেহ রইল না।

হার্মানিয়ম বেজে উঠল, তার সঙ্গে বাঁশী বেহালা এস্রাজ—

বেণী রচনা করতে করতে সুভদ্রা গাইতে লাগল :

> "আমারে সাজালে কি গো খেলার ছলে—
> ভাসাতে আমারে বন্ধু নয়ন জলে !
> জান না কি, আমি জানি
> আমার হৃদয় খানি—
> তোমারি মধুর ছবি শতেক দলে"...

সময়োপযোগী গান কণ্ঠস্থ হ'য়ে থাকে, চলচ্চিত্রের এই আর্ট ভারি চিত্তাকর্ষক। আমাদের কথাই জোটে না, গান ত' খুবই দুষ্প্রাপ্য জিনিস ; কিন্তু ভুললে চলবে না যে, আমরা অত্যন্ত সাধারণ, বুঝি খুব কম !

নাটকের দৃশ্য ফিরে গেল নিরঞ্জনের গৃহে—

নিরঞ্জন আর সে মানুষ নাই—ক'-দিনেই শুকিয়ে অর্দ্ধেক হয়ে গেছে—দাড়ি বেড়ে গেছে ; ক্ষৌরকর্ম্মে যার মন নেই, তার মন কতটা চঞ্চল তা' আমরা অনুভব করলাম ; অনুকম্পা জাগল—সুভদ্রার শোক বড় বেজেছে।

দু'হাতে কপাল টিপে নিরঞ্জন আরাম কেদারায় ঢলে পড়েছে—

চোখ বুজে বসে' থাক্‌তে থাক্‌তে নিরঞ্জনের বুক অল্প অল্প করে' অত্যন্ত ফেঁপে' উঠল আবদ্ধ বাতাসের ঠেলায়...বাতাসটা সে ধীরে ধীরে

বা'র করে' দিল ; তাড়াতাড়ি টানেও নাই, তাড়াতাড়ি বেরুতেও দিল না —তা' দিলে আর্টের কি ক্ষতি হত তা' ভাবতেই পারিনে। কিন্তু রাতুল বক্সী খোকাটি নয়—পায়ের তলায় বসিয়ে আমাদের সে দশ বছর শেখাতে পারে।

একেই বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করা—সেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা দেখেই যেন পরমাত্মায় ঘা লেগে প্রাণ শুকিয়ে উঠল'।

অন্যত্র থেকে শিপ্রার গলার গানের শব্দ আসছে। পদ্মে আছে মধু —তেম্‌নি মানিনী রায়ের কণ্ঠে আছে গান ; স্বচ্ছ নদীর রৌপ্য স্রোতের মত মেদুর মোলায়েম সুরে ভেসে আস্‌তে লাগল শিপ্রার স্ফুট কণ্ঠের সঙ্গীত :

"বসন্ত জাগিল বনে—
ভুবনে ভবনে,
কুসুম ফুটিল বনে—
জীবনে যৌবনে"……

গান হঠাৎ থেমে' গেল—

মানিনী রায় গাইতে জানে যেমন, তেম্‌নি জানে গান ছেড়ে' দিতে। মানুষের মন যখন হাঁ করে' তার গানের ঝরণা ধারা বেশ পান করছে, আর কামনা করছে, এ-গান যেন ফুরোয় না, ঠিক তখনই সে ছেড়ে দেবে মানুষকে ইহ-জন্মের মত তৃষ্ণাতুর রেখে'।

মহেশ এল—

গায়ে ফতুয়া, কাঁধে গামছা ; কিন্তু গান গাইতে পারে কি না তা, বুঝা গেল না—বুঝতে দিলে মহেশ চরিত্র মাটি হত।

মহেশ বললে,—বাবু, মা জানতে চাইলেন, চা দিবেন কি না।

—দিতে বলো। বলে নিরঞ্জন ধীরে ধীরে দৃষ্টি তুলে মহেশের মুখের উপর ফেললে……

মহেশ সব জানে, এবং আদর্শ ভৃত্য বলেই দরদে পরিপূর্ণ।

মহেশের চোখ ছলছল করতে লাগল। নিরঞ্জন বললে,—মহেশ, আমি যে আর বাঁচব' না—মরে যাব।

—বুঝি সবই বাবু। একবার······

—কি বলছিস, মহেশ? একবার কি?

—খুঁজে দেখব'।

"না"—বলে' খুঁজতে বারণ করে' প্রবেশ করল চায়ের সরঞ্জামসহ শিপ্রা—

আমার গা পুলকে শিউরে উঠল'। এমন সাইকলজিক্যালি হিট্ করে প্রবেশ করা কতদূর শিহরণজনক, ভিন্ন-ধরণের লোকে তা কখনো বুঝবে না।

শিপ্রা বলতে লাগল: সে আস্‌বে। ভগবান যদি সত্যি হন, আর আমি যদি সতী হই, তবে সে আস্‌বেই। জানো ত' মহেশ, আমি কখনো মিথ্যে বলিনে।

—তা' সত্যি মা। মহেশ সবিনয়ে নিবেদন করলে।

বলুন দেখি, শক্তি কি একেই বলে না। স্বামীর প্রণয়িনীকে শিপ্রা স্বামীর কাছে টেনে' আন্‌তে চায় ডাকে নয়, রেলে নয়, ষ্টীমারে নয়, নিজে মানুষকে সুপথে চালিত করবার ভগবানের যে ইচ্ছা আছে তারি মারফৎ, আর নিজের সতীত্বের জোরে।

নিরঞ্জন আর মহেশকে এ যুক্তির কাছে পরাভব মানতে হ'ল। চা দে'য়া হল নিঃশব্দে······

নিঃশব্দে চা-পান করতে করতে নিরঞ্জন হঠাৎ একবার কাৎরে উঠল, কিন্তু শিপ্রা······

শিপ্রা বললে—তোমার জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। দেহ শুকিয়ে কখানা হাড়ে দাঁড়িয়েছে তা' জানো?—বলতে বলতে কান্নায় তার গলা ভেঙ্গে' এল।

নিরঞ্জন হতাশভাবে ডান হাতখানা একবার ঊর্দ্ধদিকে ছুড়ে বললে,—তা-ই হোক, শিপ্রা—তুমিই তাকে বেশী জানো।

চট্ করে' দৃশ্যান্তরে নেয়া হল......

বিশ্বনাথের শয়নকক্ষ—বিশ্বনাথ মশারির ভিতর শুয়ে আছে—ভিতরটা আবছায়ার ভিতর সুন্দর দেখা গেল...ক্লকে রাত্রি বারটা বাজে। দূরে স্বতন্ত্র শয্যায় পদ্মা নিদ্রামগ্না।

মশারির ভিতর শায়িত বিশ্বনাথ উঠবার উদ্যোগ করছে—আগে মাথাটা সে বালিশের উপর থেকে তুলল,—তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল।

আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠলাম......বিশ্বনাথের ইচ্ছা নয় যে, পদ্মার ঘুম ভাঙে—শব্দ হলেই তার ঘুম ভেঙে যাবে—

কিন্তু শব্দ হল না—

নিঃশব্দে মশারি তুলে পালঙ্ক থেকে সে ধীরে ধীরে নামল; পদ্মার দিকে দুবার পিছন ফিরে তাকিয়ে পা টিপে টিপে সে দরজার কাছে গেল—নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বিশ্বনাথের সম্মুখে যেন স্বপ্নলোক কায়াময় হয়ে বিরাজ করছে—জ্যোৎস্নালোকিত উদ্যানবাটিকা একটি—আলোকে ছায়ায় অনুপম আর লোভনীয়—বড় গাছও নেই, এমন নয়।

বিশ্বনাথ খানিক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করল—নিজেরই গৃহসংলগ্ন উদ্যান যেন সে আজ প্রথম দেখল।

কিন্তু সে আজ প্রথম দেখে নাই—

মন্ত্রে বস্তু যেমন পূত হয়, একটি লোকের আবির্ভাবে ঘরের চেহারা যেমন ফিরে যায়, তেমনি, লক্ষ বার দেখা উদ্যান রূপান্তর গ্রহণ করেছে বিশেষ একটা কারণে—

ক্লোজ আপ এ দেখা গেল, একখানি হাত কেবল—বড় একটা গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী-মূর্ত্তি—তারই হাত একখানা ঝুলে আছে আর দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বনাথ বাগানে নামল, তারপর চোরের মত চারিদিকে খুব সতর্কভাবে তাকাতে তাকাতে আর প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে নারীমূর্ত্তির সেই হাতখানা পিছন থেকে টপ করে চেপে ধরল—

গাছের আড়ালে হাসির শব্দ উচ্ছসিত হয়ে উঠল।

আলো নিবে গিয়ে ফুটল বাগ'নেরই অপরাংশ; সুভদ্রা আর বিশ্বনাথ পাশাপাশি বেড়াচ্ছে……

আলো ছায়ার সঞ্চরণ ভারি মধুর লাগল।

খানিক নিঃশব্দে পায়চারি করার পর বিশ্বনাথ ডাকল, সুভা……

—কি বলছ? সুভদ্রা অন্যমনস্কভাবে একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে জবাব দিলে।

—এ কি ভাল হচ্ছে?

—কি ভাল হচ্ছে! আমাদের এই ভালবাসা ভাল হচ্ছে কি না জানতে চাইছ?……তুমি কি অনুভব করছ জানিনে; কিন্তু আমি ত'……

—আমি ত কি সুভদ্রা?—ভারি হৃদ্যভাবে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করল।

—আমি এই বুঝি যে, যদি ভালমন্দ বিচার করতে পারলাম তবে অন্তরের আহ্বানকে আর চিন্তার স্বাধীনতাকে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিলাম কই? শোনো নাই কি, ভালবাসায় বাধা পেয়ে মানুষ মরেছে! লজ্জা ভয় ত্যাগ করা ত অতি তুচ্ছ কথা!……কার অপ্রীতির কথা ভাবছ তুমি, স্ত্রীর?

—হ্যাঁ, ভদ্রা।

বিশ্বনাগ সুভদ্রাকে প্রথমে ডেকেছিল সুভা বলে, তারপর এখন ডাকল ভদ্রা বলে।

মনে হল, প্রেমিকাকে আদর করা শিখতে হয় আর্টিস্টের কাছেই। …সত্য কথা বলতে বিশ্বনাথের বাধল না, সুভদ্রার কাছে খাটো হবার ভয় তার হল না—এটাও, এই নির্ভীকতাও, বেশ লক্ষ্য করার বিষয়।

সুভদ্রা বললে—তবে আমাকে বিদায় দাও……

—তা ও যে ভাবতে পারিনে! বিশ্বনাথ ব্যথিত স্বরে বললে, কিন্তু তার সে কথা সুভদ্রার কানে গেল না।

সে বলতে লাগল, হাঁ, তাই দাও; আমি বিদায় নিই।…কিন্তু তার আগে একটা কথা বলব তোমাকে। শুনবে?

—শুনব ভদ্রা। তোমার কথা শুনব।

কথাটা বুঝতে না দেওয়াই নাট্যকারের উদ্দেশ্য, তা বুঝলাম। "তোমার কথা শুনব" বলে বিশ্বনাথ কিসে রাজি হল।

সুভদ্রা বললেঃ অন্তরে অন্তরে কিসের সন্ধান অহরহ চলছে জানো?

যা তা একটা জবাব বিশ্বনাথ আন্দাজেই দিল না, বললেঃ জানিনে ভদ্রা।

'জানিনে' বলতে পারা খুব সাহসের পরিচয়।

—চল্‌ছে পরিপূর্ণতার সন্ধান। তুমি আমি দু'জনে পরিপূর্ণ একটী সত্তা। এই সন্ধানের ক্ষেত্রে যে ইতস্ততঃ করে' সে নির্ব্বোধ, নিজেকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু তুমিত নির্ব্বোধ নও।...আমি তোমাকে পেয়ে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছি—তুমি আমাকে পেয়ে তা' হওনি'। অনাবশ্যক হ'য়েও আমি থাক্‌তে চাইনে। আমি যাব। যেখানে দ্বন্দ্ব দ্বিধা সেখানে আমার সমগ্র হৃদয়ের প্রবাহ রুদ্ধ হ'য়ে আসে—নিশ্চল উত্তপ্ত বাতাসের মত সে বড় প্রাণান্তকর।—বলে' বাতাসের প্রাণান্তকরতায় সুভদ্রা হাঁপাতে লাগল।

এই ঘাত-প্রতিঘাত কত যে উপভোগ করলাম তা' ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

—যেও না, সুভদ্রা। বিশ্বনাথ অসহ্য কাতরোক্তি করলে।

—যেতে পারলে যেতাম; কিন্তু আমি বন্দিনী যে! তোমার পাঁজরার হাড়ের খাঁচায় আমি বন্দিনী।—সুভদ্রা বললে।

—সত্যই তা'-ই সুভদ্রা। বিশ্বনাথ চেঁচিয়ে উঠল। সুভদ্রা আরো কি বলে শুন্‌বার জন্য প্রাণপণে কান খাড়া করে' থাক্‌লাম...

কিন্তু ভুল করলাম—আর্টের জ্ঞান আমার ভাল করে' হয়নি' এখনো।

সে-দৃশ্য থাক্‌ল' না বেশীক্ষণ; সুভদ্রা বললে না কিছুই...বিশ্বনাথ তার দিকে কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে থাক্‌ল'...

পট করে' ছবির গতি বন্ধ হ'য়ে গেল।

দৃশ্যান্তর : ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার অভ্যন্তর : নিরঞ্জন বসে' আছে—থাকতে থাকতে স্বগতোক্তি করল' : "চলেছি তার সন্ধানে"—

"সন্ধানে" শব্দটা নিরঞ্জনের মুখে উচ্চারিত হ'তেই যেন ঠিকরে উঠলাম। কৌশলটা একবার দেখুন। একটি শব্দের সঙ্গে কেমন কৌশলে একটা ভাবধারা জড়িয়ে রাখা হয়েছে! "সন্ধানে" শুনেই মনে পড়ে' গেল সুভদ্রার কথা ; সে বিশ্বনাথকে বলেছিল : " অন্তরে অন্তরে কিসের সন্ধান অহরহ চলছে জানো ? চলছে পরিপূর্ণতার সন্ধান।" ... সুভদ্রার কথা তা' হ'লে ঠিক—পরিপূর্ণতার সন্ধানেই নিরঞ্জন চলেছে, অপরিপূর্ণতা আর সইতে না পেরে।

নিরঞ্জন বলতে লাগল : সূর্য নিবে গেছে—সংসার অরণ্য তুল্য, মানুষের সংসর্গ বিষময়...কিন্তু তাকে খুঁজে' পাবো কি আমি! সে ভাগ্য কি আমার হবে! ঈশ্বর জানেন। শিপ্রা বলেছে, আমার মনোরথ সফল হবে। ভগবান শিপ্রার মঙ্গল করুন। ...বলেই নিরঞ্জন থাম্‌ল।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার বলতে সুরু করা, কথা বলার একটা উৎকৃষ্ট প্রণালী—ভাবের দ্যোতনা তা'তে করে' এমন গভীর হ'য়ে ওঠে যে, হাজার রকম ভঙ্গী করেও তেমনটি পারবেন না।...আর একটা কথা, শিপ্রা বলেছে, তার স্বামীর মনোরথ সফল হবে। কথাগুলো বুঝে দেখে' চিরকাল মনে রাখার মতো।

একটু থেমে নিরঞ্জন বলতে লাগল',—যে সূত্র পেয়েছি তা'-তে মনে হয়, এদিকেই সে গেছে। যেদিকেই যাক তাকে আমি খুঁজে বার করব যেমন করে খুঁজে বার করা হয়েছিল বিশল্যকরণী, লক্ষ্মী, অমৃত, সেই পুরাকালে।

ঐ জিনিষগুলির নামোল্লেখে সুভদ্রার অপরিহার্য্যতা আর মনোহারিত্ব এমন সংক্ষেপের ভিতর আর সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট হ'ল, আর তার পবিত্রতা জাগ্রত হ'ল যে, মাথা নত করে, তা' গ্রহণ করলাম।

নিরঞ্জন পুনরায় বললে : পাই যদি ফিরব, আবার গৃহবাসী হ'ব... কিন্তু যদি না পাই! উ, ভাবতে পারিনে যে তাকে পাইনি...

নিরঞ্জন মাথার দিকে হাত তুলছে, এমন সময় পোঁ করে, দৃশ্য বদলে' গেল।

শিপ্রা বসে' আছে হাসি মুখে—সুভদ্রার মেয়েটি দোলনায় ঘুমুচ্ছে ···ক্লোজ-আপ-এ দেখান' হ'ল মেয়েটির মুখ, তারপর শিপ্রার মুখ—শিপ্রার মুখের হাসি। মানিনী রায়ের অভিনয় দেখা মানেই তার হাসি দেখা—অমন অবর্ণনীয় অভিব্যক্তি দিয়ে অথচ সুন্দর স্বাভাবিক ভাবে হাসতে জানে, আবার বলি, গ্রেটাগার্বো, আর বাংলার এই মানিনী রায়।

ভৃত্য মহেশ প্রবেশ করল' গান গাইতে গাইতে ঃ

গা চলে ত' মন চলে না—
কেন রে মন চলিসনে ;
মন টলে ত' বুক টলে না—
কেন রে বুক টলিসনে !

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে গানটা শেষ করল' প্রভুপত্নীর একেবারে কানের গোড়ায়—

ওরে বোকা অচল হলে
আগুনে তুই মরবি জ্বলে'—
ছুটে যা রে তারি কাছে,
পিছের টানে ভুলিসনে।

আরো খানিকটা ছিল—তা'-ও শেষ করে মহেশ বলল ; মা, বাবু কবে ফিরবেন ? ছেড়ে দেয়া কি ভাল হ'ল !

মহেশের কণ্ঠ আর্দ্র।

শিপ্রা বললে—ভাল মন্দ তিনি যেমন বোঝেন, মহেশ, আমরা তেমন বুঝিনে। তাঁর মতো ভালমন্দের বিচার করতে আজ পর্য্যন্ত কেউ শেখেনি,' এ আমি জোর করে বলতে পারি।

জোরটা আমরাও অনুভব করলাম।

—কিন্তু যদি না পান তাঁকে—যদি দেখা না পান।

—ফিরবেন না, কিন্তু অমর হয়ে থাকবেন সংসারে—তোমার আমার

সকলের কাছে।...প্রেমের আকর্ষণে নিরুদ্দেশ হওয়া তুচ্ছ কথা নয়, মহেশ। হৃদয় বড় না হলে তা পারা যায় না।...আমি ভারি গর্ব্ব অনুভব করছি, আমার স্বামী প্রেমিক।

শুনে আমার সামনের বেঞ্চির পাঁচ সাত জন লোক একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে হুররে হুররে করে লাফাতে লাগল। বর্ত্তমানের এই জয়যাত্রায় আমি ওদের সঙ্গে সমান তালে তৎক্ষণাৎ যোগ দিতে পারলাম না কেন তা জানিনে।

হঠাৎ পিছিয়ে পড়ে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল...

—তুমি তাঁকে ক্ষমা করতে পারবে, মা ?

স্নিগ্ধ কণ্ঠে শিপ্রা বললে মহেশকে, ক্ষমা কিসের জন্য মহেশ।... তারপর বললে, আমিত' বলেছি, মহেশ, অপরাধ তিনি করেন নাই। তিনি আমাদের বরেণ্য।

বুঝবার একটা চমৎকার ভঙ্গী করে' মহেশ ঘুরে দাঁড়াল।

দৃশ্য দেখলাম, নক্ষত্রবেগে ট্রেণ ছুট্‌ছে...বুঝলাম এই ট্রেণেই নিরঞ্জন চলেছে "সন্ধানে"।

ট্রেণ দাঁড়াল ; অবতরণ করল নিরঞ্জন। গাড়ীতে বসে থাকার সময় সে শোকাবেগে খালি মাথার চুল টেনেছে বসে বসে—রুক্ষ চুল আলু থালু হয়ে আছে...প্লাটফর্ম্মের লোকগুলো তাকে কেমন করে যেন তাকিয়ে দেখছে—অদ্ভুত কিছু দেখছে যেন।...উদ্দেশ্য যাঁর মহৎ, তার উদ্দেশ্য নিয়েই তাকে বিদ্রূপ করতে দেখলে যেমন রাগ হয়, লোকগুলোর হৃদয়হীন চাউনি দেখে আমার ঠিক তেম্‌নি রাগ হল ...

আবার এটাও সত্য যে, দর্শকের মনে অনুকম্পা জাগাবার এই আর্টের শ্রেষ্ঠত্ব আর নাট্যকারের রসসৃষ্টির ক্ষমতা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করে' পুলকও পেলাম।

নিরঞ্জন আপন মনেই বললে, এইদিকেই এসেছে শুনলাম ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কাকে ?

বলতেই—

এমন ঘটনা সংযোগ দেখেছেন কখনো। দেখে' থাকলে ভাবুন খানিক।

"জিজ্ঞাসা করি কাকে ?" বলে'উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিরঞ্জন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় একেবারে তার কাছে এসে দেখা দিল, আর কেউ নয়, বিশ্বনাথ ...

—আপনার নিবাস ?—বিশ্বনাথ যথেষ্ট ভদ্রভাবে জান্‌তে চাইলে।

—নিবাস! নিবাসই আমি খুঁজছি। যেখানে আমি জন্মেছি সে আমার নিবাস নয়, যেখানে বাস করি সেথায় আমার নিবাস নয়, নিবাস আমার একটি নারীর প্রীতিসঞ্চালিত অঞ্চলের ছায়ায়...

নিরঞ্জনের দৃষ্টি ধ্বক ধ্বক করতে লাগল...

—তার মানে ?

—চুলোয় যাক তার মানে। সুভদ্রা বলে' একটা মেয়েকে দেখেছেন ? সে কোথায় তা'—বলতে পারেন ?

বুক ধড়ফড় করতে লাগল—

ক্লাইম্যাক্স আস্‌ছে দেখে তা' যার না করে, সে যেন টকি দেখতে আসে না।

বিশ্বনাথ শান্ত স্বরে বললে,—পারি।

নিরঞ্জন আর্ত্তনাদ করে' উঠল ; পারেন ? কেমন করে' পারেন ? কখন্ পারেন ? যদি সত্যই পারেন, তবে আমি এ জন্মের মত আপনার ক্রীতদাস হ'য়ে থাকব ...

রাতুল বক্সী বাহাদুর ছেলে—

কথাগুলো যেন ঠাস্ ঠাস্ করে' আমাদের বুকে এস পড়ল...আর মনে হ'ল, দানীবাবু ছিলেন এর তুলনায় কত মৃদু। নিরুদ্দিষ্টা কন্যার সন্ধান পেয়ে তিনি দস্যুকে লক্ষ্য করে অনেক চীৎকার করেছিলেন বটে, কিন্তু...

মনে মনে ঘাড় নেড়ে দানীবাবুকে নাকচ করে' দিলাম।

প্রোডিউসার খুব সঙ্গত ভাবেই বিশ্বনাথকে একটু চঞ্চল হ'তে দেননি।

বিশ্বনাথ অচঞ্চল ভাবে বল্‌ল, সুভদ্রা উল্টো দিকে গেছে। আপনি কি নিরঞ্জন?

হাঁ, আমি নিরঞ্জন। বলি নাই, আমি নিরঞ্জন!

নিরঞ্জনের অসহিষ্ণুতা খুবই স্বাভাবিক।

বিশ্বনাথ খবর দিলে,—আপনার কাছেই সে গেছে।

—আমার কাছে গেছে! আর আমি এখানে!

নিরঞ্জনের কণ্ঠস্বর প্রেক্ষাগৃহের চারি দিকে প্রতিধ্বনিত হ'ল—টিনের ছাদে তা' বেজে' উঠ্‌ল ঝন্ ঝন্ করে'।

—ফিরবার গাড়ী কখন জানেন?

—দেড় ঘণ্টা বাদেই মেল আসবে। এ স্টেশনে মেল দাঁড়ায় না। তবে যদি হেঁটে আপনি আগের ষ্টেশনে যেতে পারেন তবে মেল ধরতে পারবেন। মেল সেখানে দাঁড়ায়। সুভদ্রার আগেই আপনি পৌঁছে যাবেন—সে গেছে প্যাসেঞ্জারে।

—মাঝে মেল দাঁড়াবে না?

না।

—ধন্যবাদ।

দৃশ্যের বদল হল।

নিরঞ্জন ব্যাগ নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছে আগের ষ্টেশনের দিকে... ভারি শ্রান্ত, ভারি কাহিল...

দেখে ভক্তি আরো বেড়ে গেল।

নিবে গিয়েই ফুট্‌ল' ষ্টেশন—নিরঞ্জন গাড়ীর প্রতীক্ষা করছে... অত্যন্ত অস্থির। ট্রেণ এল—নিরঞ্জন ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়ল।

পুনরায় ষ্টেশন—নিরঞ্জন নাম্‌ল'...দৌড়ে গিয়ে উঠ্‌ল মটরে... মটরে উঠে, তার মুখটা ঈষৎ প্রসন্ন হয়েছে মনে হল—কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ তা' ধরতে পেরেছে বলে' মনে হ'ল না।

তারপরই হুস্ করে' বাড়ীতে—

"সে আসছে, শিপ্রা" বলে' চীৎকার করতে করতে আর লাফাতে লাফাতে নিরঞ্জন সিঁড়ি ভেঙ্গে' উঠতে লাগ্‌ল'...

শিপ্রাও ছুটে' এসে নাম্‌তে লাগল ; জিজ্ঞাসা করল,—আসছে ?... কণ্ঠে কত যে আকুলতা তার ইয়ত্তা কে কর্‌বে !

উপর দিকে চেয়ে নিরঞ্জন থম্‌কে' দাঁড়াল',— হ্যাঁ শিপ্রা, আস্‌ছে। তুমি তাকে গ্রহণ করবে তা' জানি।...সে বড় দুখিনী।

প্রেক্ষাগৃহ ছলছল করতে লাগল'।

কলকণ্ঠে শিপ্রা বললে'—তুমি বুঝি ভুলে' গেছ এরই মধ্যে আমি তাকে দিদি বলে' ডেকেছি, ভেবেছি ?

মহেশ এই মিলনানন্দের মাঝে নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে গাম্‌ছায় চোখের জল মুছল।

ট্রেণ—

দেখা গেল, একটা তৃতীয় শ্রেণীর কাম্‌রার ভিতর সুভদ্রা বসে আছে —ক্লোজ্ আপ্ হ'ল ; দেখলাম, মুখ পাণ্ডুর, আর চক্ষু উজ্জ্বল।

আর বোধ হয় আমিই কেবল লক্ষ্য করলাম, সর্ব্বাবয়বে অসাধারণ কোমলতা এবং ক্লান্তি...

ষ্টেশন—মোটর—তারপরই দেখলাম, সুভদ্রা ধীরে ধীরে উঠ্‌ছে সিঁড়ি দিয়ে...

সুপারইম্পোজ করা হল—কক্ষের ভিতর টেবিলের ধারে বসে' নিরঞ্জন ঝড়ের বেগে টাইম টেবিলের পাতা উল্টাচ্ছে—শিপ্রা সেই দিকে নিমগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মহেশ দু'জনের মুখের দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে তাদের কাজ দেখ্‌ছে...

আমি ত' ভেবে পেলাম না' কেমন করে' এমন ঘটে—যারা ঘটায় তাদের বুদ্ধিই বা কত! দিব্য স্বাভাবিক অথচ এমন উত্তেজক যে, আমাদের মাথা ঠিক থাকে না...ভেবে রাখলাম, যেমন করে পারি রাতুল বক্সীর সঙ্গে একদিন নিশ্চয় দেখা করব'।

ঝড়ের বেগ, অর্থাৎ পাতা উল্টানো হঠাৎ এক জায়গায় থামিয়ে নিরঞ্জন বল্‌লে,—এতক্ষণ ত' আস্‌বার কথা। ট্রেণ পৌঁছেচে দশটা দশে; মটোরে আস্‌তে ধরো আধ ঘণ্টা; দশটা চল্লিশে পৌঁছবার কথা; কিন্তু এখন (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) এগারটা দশ...

বল্‌তেই শিপ্রা এবং মহেশ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ঘড়ির দিকে তাকাল'—

ঘড়ির ক্লোজ আপ্‌ হ'ল; আমরাও দেখ্‌লাম, এগারটা দশ নির্ঘাৎ।

খানিক্‌ উৎকর্ণ হ'য়ে থেকে শিপ্রা বল্‌লে,—এল বলে'...

মুখের কথা ফুরতে না ফুরতে "ঐ এসেছে" বলে নিরঞ্জন দু'হাত তুলে' লাফিয়ে উঠ্‌ল...

পায়ের শব্দ আমরাও শুন্‌তে পেলাম...আর থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগ্‌লাম। ক্লাইম্যাক্স হবে সত্যিই এম্‌নি থর্‌থর্‌ করে' কাঁপিয়ে তুলবে আপাদ মস্তকে...

সুভদ্রা প্রবেশ করল'—

এই অবস্থায় কেমন করে প্রবেশ করতে হয় তা' শিখে নিক্‌ দশজনে—

শিপ্রা গেল এগিয়ে, নিরঞ্জন গেল এগিয়ে, মহেশ নড়ল' না...

কিন্তু সুভদ্রা দু'পা পিছিয়ে গেল; বল্‌লে,—এসো না আমার কাছে ...এস না, এস না...আমি পাপ করেছি...

ব'লে সুভদ্রা থামের গায়ে এলিয়ে পড়ল'।

তুমি পাপ করতে পারো না, সুভদ্রা; তোমাকে আমি জানি, যেমন জানি চন্দ্র সূর্য্য ধ্রুবতারাকে।

চন্দ্র সূর্য্য আর ধ্রুবতারার নির্ম্মলতা অবিসম্বাদিত।

শিপ্রা খালি বল্‌লে,—দিদি...

এ-অভ্যর্থনার তুলনা হয় না; কণ্ঠস্বরে সমগ্র আত্মাকে উদ্গত আর ধ্বনিত করতে পারে কেবল মানিনী রায়।

সুভদ্রা দ্বিগুণ কাতর হয়ে বল্‌লে, না, আমি ফিরে যাই।...আমি প্রলুব্ধা হয়েছিলাম—আশ্রয়গৃহ হ'তে আমি বিতাড়িতা...বুঝেছো?...

াকে তোমরা ক্ষমা করো—যেতে দাও।

—যেতে দেব না, দিদি।

—যেতে দেব না, সুভদ্রা।

ক্রমান্বয়ে শিপ্রা আর নিরঞ্জন বল্লে…তাদের ঐ অমর উক্তি শেষ হই প্রেক্ষাগৃহে একটা তুফান উঠল যেন…শব্দ উঠ্ল করতালিরই, ন্তু এমন হাত ফাটিয়ে করতালি কোনো সঙ্ঘ কোনো বিজয়ীকে ভনন্দিত করে আজ পর্য্যন্ত দেয়নি'।

করতালি অবশেষে থাম্লে শুনতে পেলাম নিরঞ্জন বল্ছে,—নারীর নই যদি ক্ষমা করতে না পারলাম, তবে ধর্ম্ম কি আমাকে ক্ষমা বেন…পতিতা নারীকে পদাঘাত করে রসাতলে নামিয়ে দেয় যে-ধর্ম্ম ধর্ম্ম আমার নয়।…তুমি এস, তুমি সত্যরূপিনী…তোমাকে মি বড় ভালবাসি।

বলে, নিরঞ্জন দূর থেকেই সত্যকে নমস্কার করল' দু'হাত কপালে করে।

"এস দিদি।" বলে' শিপ্রা যেয়ে সুভদ্রার হাত ধরল…

মহেশ বল্লে, ধর্ম্মই সত্য, আর সত্য প্রেম।

সবারই সঙ্গে আপোষ হয়ে যাওয়ায় সুভদ্রা হাস্তে লাগ্ল এবং সতে লাগল নিরঞ্জন প্রমুখ সবাই।

শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু আমাদের বুক ভরে' রইল রসে আর চারিত্রিক মহিমার ানন্দে…

তারপর "দাড়ি-মাহাত্ম" ফাস' দেখে প্রাণ ভরে হাস্তে হাসতে ড়াতে ঢুক্তেই সাড়া পেয়ে মা বল্লেন,—খোকা, আমার কাঁসার বড় টিটা খুজে পাচ্ছিনে রে।

—অসাবধান হলে চুরি ত' যাবেই!—বলে' কাপড় ছাড়তে গেলাম।

———